# কাঙ্গাল হরিনাথ



শ্রীজলধর সেন

মূল্য পাঁচ সিকা

# উৎসর্গ পত্র

বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ

## শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্‌ মহ্‌তাব্‌ বাহাদুর

শ্রীকরকমলেষু।

মনস্বী থিয়োডোর পার্কার বলিয়াছেন "Wealth and want equally harden the human heart. সত্যই ঐশ্বর্য্য ও দারিদ্র্য —উভয়ই মানুষের শত্রু। উভয়ই মানুষের মনুষ্যত্ব অপহরণ করে, উভয়ই মানুষের অন্তঃকরণের সরলতা, চিত্তের কোমলতা বিনষ্ট করে। কিন্তু প্রতীচ্যের মনীষীর এই মহাবাক্য যে সর্ব্বত্র সুপ্রযুক্ত হইতে পারে না, বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে তাহাই আমি সপ্রমাণ করিব।

বাণীর বরপুষ্ট কমলার চিরউপেক্ষিত স্বর্গীয় কাঙ্গাল হরিনাথ দরিদ্র ছিলেন; কিন্তু সহৃদয়তায় তিনি দীন ছিলেন না। স্বয়ং দরিদ্র হইয়াও দরিদ্রের দুঃখ মোচনে, ব্যথিতের বেদনা অপনোদনে অক্ষুণ্ণভাবে আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এবং সেই অক্লান্তকর্ম্মা কর্ম্মবীর চিতা-শয্যায় বিশ্রাম লাভ করিবার পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আপনার ধৃত ব্রত পালন করিয়া গিয়াছেন।

আপনি ঐশ্বর্য্যশালী 'কমলার প্রিয় সুত বরদার আশা' কিন্তু আপনার চিত্তের কোমলতা, হৃদয়ের স্নেহপ্রবণতা, অন্তঃকরণের ঔদার্য্য ও মহত্ত্বের সহিত যাঁহারা অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত তাঁহারা অকুণ্ঠিতচিত্তে

স্বীকার করিবেন যে, কর্ত্তব্যের পথ যতই তরঙ্গসঙ্কুল হউক, আপনি অনায়াসে—অবলীলাক্রমে তাহাতে 'খেয়া' দিতে পারিবেন।

কাঙ্গাল শতছিদ্রময় পর্ণকুটীরে সাধনবেদীর উপর যোগাসনে পরহিতচিন্তায় অভিনিবিষ্ট থাকিতেন; আপনি সৌধকক্ষাধিষ্ঠিত স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া জনহিতে ব্যস্ত—উভয়ের মধ্যে অবস্থাগত এই প্রভেদ থাকিলেও চরিত্রগত, প্রকৃতিগত সাদৃশ্য বহুল পরিমাণে বিদ্যমান, ইহাই লক্ষ্য করিয়া কাঙ্গাল হরিনাথের চরিত-কথা আপনার শ্রীকরে সমর্পণ করিয়া কাশীরাম দাসের ভাষায় বলিতেছি—

কাঙ্গাল চরিত-কথা অমৃত সমান;<br>
অধম অকৃতি কহে শুনে পুণ্যবান।

আপনার গুণমুগ্ধ

শ্রীজলধর সেন

বৰ্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ মাননীয়

শ্রীযুক্ত স্যর বিজয়চন্দ্‌ মহ্‌তাব্‌ বাহাদুর।

শ্রীগোপাল প্রেস

# কয়েকটী কথা

'কাঙ্গাল হরিনাথ' মানসী পত্রে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছে। তাহারই অংশমাত্র লইয়া এই প্রথম খণ্ড রচিত হইল। মানসীতে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অপেক্ষা অনেক নূতন কথা এবং অনেক অপূর্ব্ব-প্রকাশিত গীত এই খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হইল।

আমি কাঙ্গাল হরিনাথের জীবন-কথা লিখি নাই। তাহা লিখিবার জন্য সে সাধনার প্রয়োজন তাহা আমার নাই। আমি সেই কর্ম্মবীর ও ধর্ম্মবীরের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা মাত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছি, এবং তাহাও আমার অক্ষমতা দোষে যেমন হওয়া উচিত ছিল তেমন হয় নাই। তাহার পর আমি কাঙ্গালের বাল্যজীবন, তাঁহার সাহিত্য-সাধনা, তাহার দেশহিতে আত্মোৎসর্গের কথা, তাঁহার সাধনতত্ত্ব—এ সকল কিছুই না বলিয়া তাঁহার বাউল-সঙ্গীত ও অন্যান্য গীতের মধ্য দিয়া তাঁহাকে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি। জীবন-চরিত লিখিবার এ রীতি নহে, তাহা জানিয়াও আমি এই কার্য্য করিয়াছি। তাহার কারণ এই যে, কাঙ্গালের বাউল-সঙ্গীতের ভিতর দিয়া আমি তাঁহাকে যেরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি এমন আর কিছুতেই পারি নাই!

প্রথম খণ্ডের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া আমি তাহা কাঙ্গালের প্রিয় শিষ্য, আমার সোদরাধিক প্রিয় শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়কে প্রেরণ করি; আমার আশা ছিল যে, তিনি আরও অনেক নূতন কথা ইহার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিবেন। কিন্তু তিনি পাণ্ডুলিপির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমাকে লিখিলেন "তুমি যাহা করিয়াছ তাহা বেশ হইয়াছে। ইহার মধ্যে আর কিছু দেওয়ার সাহসও হইল না, প্রয়োজনও বোধ

করিলাম না। তোমার ভাবের স্রোত যে পথে চলিয়াছে তাহাই ঠিক।" আমি তবুও তাঁহাকে ছাড়িলাম না; এই পুস্তকের একটা ভূমিকা লিখিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম। তিনি তাহার উত্তরে আমাকে লিখিলেন—

"জলদা—তুমি কাঙ্গালের কথা লিখিয়া বহী ছাপাইতেছ;—আমি কিছুই সাহায্য করিলাম না বলিয়া ক্ষুণ্ণ হইও না। আমি কাঙ্গালের কথা লিখিবার অনুপযুক্ত,—অনধিকারী। তাঁহার জীবন ধর্ম্মময় ছিল বলিয়া কর্ম্মময় ছিল,—কর্ম্মময় ছিল বলিয়াই ধর্ম্মময় হইয়াছিল। তিনি সাধনোচিত পুণ্যলোকে চলিয়া গিয়াছেন। তখনও শোক করি নাই,—এখনও করিব না। তাঁহার সাধুসংসর্গে যে সকল দিন কাটিয়া গিয়াছে, তাহা এখনও সুখস্বপ্নময় বলিয়াই অনুভব করি। আমরাও একদিন কর্ম্মের বোঝা নামাইব; কিন্তু তাঁহার মত নামাইতে পারিব না।

কাঙ্গালের কথা লিখিতে গিয়া আমার কথা লিখিয়া আমাকে বড় বিপন্ন করিয়াছ;—তোমার নিকট এরূপ স্নেহের প্রতিদান পাইবার আশঙ্কা করি নাই।" যে জীবন-কথা লিখিতে অক্ষয়কুমারের ন্যায় প্রতিভাশালী, মনস্বী ব্যক্তি নিজেকে অনধিকারী বলিলেন, আমি তাহাই লিখিলাম এবং ছাপাইলাম। কেন এমন কাজ করিবার দুঃসাহস আমার হইল, তাহা আমিও বলিতে পারি না। তবে আমার একটা সান্ত্বনা আছে; আমি কাঙ্গালের পবিত্র জীবনের যে দুই এক কথা যেমন করিয়াই বলিয়া থাকি, তাহাতেই আমাকে ধন্য মনে করিয়াছি।

পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় কাঙ্গাল হরিনাথ সম্বন্ধে যে একটী ক্ষুদ্র কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিলাম——

"যখন বঙ্গের গ্রামে দীন প্রজাগণ
উৎপীড়ন অত্যাচার নীরবে সহিত ;
না জানিত রাজদ্বারে করিতে রোদন,
নিজের অভাব নিজে বুঝিতে নারিত ;
সে সময়ে হরিনাথ বীরের মতন,
অনন্যসহায় ঘোর যুদ্ধে দাঁড়াইলা,
লেখনী সম্বলমাত্র, নির্ভীক হৃদয়ে,
জীবনের দীর্ঘকাল একাকী যুঝিলা।
বারেক কর্ত্তব্যবোধ, পরপ্রীতি আর,
মানব হৃদয়ে মূল করিলে বিস্তার
এক দরিদ্র কেহ কি করিতে পারে,
হরিনাথ গ্রামবার্ত্তা নিদর্শন তার !
শিক্ষক, রক্ষক, যোগী, ত্রিকালে ত্রিবেশ,
যৌবনে, বার্দ্ধক্যে, প্রৌঢ়ে দীপ্ত উপদেশ।"

কুমারখালী
১৫ই আশ্বিন ১৩২০।



শ্রীজলধর সেন।
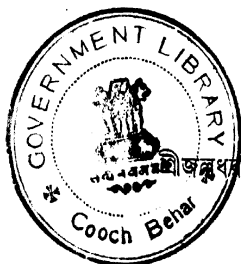
# কাঙ্গাল হরিনাথ

## জীবন-কথা

আজকাল মাতৃভাষা বলিয়া বঙ্গভাষার প্রতি এ দেশের লোকের দৃষ্টি দিন দিন অধিক আকৃষ্ট হইতেছে। কে কোথায় মাতৃভাষার উন্নতির জন্য ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের জীবন ও চরিত্র কিরূপ ছিল, তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য অনেক জীবনচরিত-লেখক পরিশ্রম স্বীকার করিতেছেন; এবং বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি জীবন-চরিত প্রকাশিত হইয়া, সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সময়ে কাঙ্গাল হরিনাথের সাহিত্য-জীবন সাধারণের গোচরীভূত হইলে, দেশের পক্ষে উপকার সাধিত হইতে পারে। যাঁহারা দরিদ্রতার এবং অভাবের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়াও আত্মোন্নতির সঙ্গে মাতৃভাষার উন্নতি একত্র বিজড়িত করিয়া আপন কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়া গিয়াছেন কাঙ্গাল হরিনাথ তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। বাল্য হইতে যৌবন, যৌবন হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত তিনি এক দিনের জন্য স্বদেশের ও বঙ্গসাহিত্যের সেবা ব্যতীত, আপনাকে অন্য কোন লক্ষ্যের সাধনায় নিয়োজিত করেন নাই। যাঁহার লেখনী বিবিধপ্রকারে মাতৃভাষাকে নানাবিধ অলঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে চিরগৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছে, সেই কাঙ্গাল হরিনাথের চরিত্র আদর্শ-চরিত্র ছিল।

৭৮ বৎসর অতীত হইল, নদীয়াজেলার অন্তঃপাতি কুমারখালি গ্রামে হরিনাথের জন্ম হয়। ৬৩ বৎসর বয়সে পুণ্য অক্ষয়তৃতীয়ায় তাঁহার তিরোধান ঘটে। যখন দয়ারসাগর পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং মনস্বী অক্ষয়কুমার দত্ত স্বদেশের উন্নতিকল্পে মাতৃভাষার সেবায় নিযুক্ত, সেই সময়ে দূর পল্লীগ্রামে এই দীন সাহিত্য-সেবক নীরবে যেরূপ উদ্যমের সহিত বিপৎপাতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, "গ্রামবার্ত্তা"র সম্পাদকরূপে মাতৃভাষার ভিতর দিয়া দেশের হিতসাধন-ব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন, সমস্ত বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে আর কাহারও সেরূপ অদম্য উদ্যম এবং ঐকান্তিকতা আছে বলিয়া জানি না। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয়, এইরূপ মহানুভব ব্যক্তির জীবনকাহিনী এতদিন সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ কোনও সমাদরের স্থান অধিকার করিতে পারে নাই।

১২৪০ বঙ্গাব্দে কাঙ্গাল হরিনাথ নদীয়ার অন্তঃপাতি কুমারখালি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মগ্রহণের এক বৎসর পরেই তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। সুতরাং মাতৃস্নেহ কি পদার্থ, তিনি তাহা জানিবার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই। তাই তাঁহার লেখার অনেক স্থানে এবং অনেক সঙ্গীতে সেই মাতৃ-স্নেহের জন্য একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি খুল্ল পিতামহীর স্নেহে ও স্তন্যদুগ্ধে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতার মৃত্যুর পরে পিতা হলধর মজুমদার মহাশয় পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন নাই, সেই কারণে তিনি সংসারে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। বিষয়কার্য্যে মনোযোগ না করায় পৈতৃকসম্পত্তি যাহা ছিল, সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করিয়া গৃহে ফিরিয়া হরিনাথ দেখিলেন তাঁহার চতুর্দ্দিক অন্ধকারপূর্ণ। বস্ত্র পরিবর্ত্তন ও "হবিষ্যান্ন গ্রহণ" করিবার সংস্থান পর্য্যন্ত নাই। যদিও বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় গুরুজনদিগের স্নেহবাৎসল্যে সে সকল কোনরূপে আসিয়া জুটিল, কিন্তু পিতৃশ্রাদ্ধ নির্ব্বাহ

করা—তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসাধ্য। এই সময় অন্যের সাহায্যের জন্য হরিনাথ বাটীর বাহির হইলেন না। ভগবানের ইচ্ছায় তাহা সুসম্পন্ন হইল। বাল্যে নিরাশ্রয় হরিনাথ খুল্লপিতামহীর স্তন্যপানে ও তাঁহার খাদ্যের অংশে জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। এখন হরিনাথকে আপনার পায়ের উপর দাঁড়াইতে হইল। তাঁহার "দুধ মাতার" নিকট-সম্পর্কীয় কোন আত্মীয়ের প্রদত্ত সামান্য অর্থ-সাহায্যে তিনি আহার্য্য সংগ্রহ করিতেন। তাঁহার আত্মজীবন-চরিতের এক স্থানে লিখিত আছে,—"বাল্যে খেলার সময় অন্য বালকেরা ক্রীড়োপযোগী বস্তু পিতামাতার নিকটে সহজে পাইয়া আনন্দ করিয়াছে, আমি তন্নিমিত্ত ক্রন্দন করিয়া মাটী ভিজাইয়াছি।" এই অন্নের অভাব, বস্ত্রের অভাব থাকায় হরিনাথের শিক্ষা সম্বন্ধে ষোল-আনা অভাব ভিন্ন কি ব্যবস্থা হইতে পারে? যদিও কাঙ্গাল হরিনাথ তৎকালের গুরুমহাশয়ের পাঠশালে কিছুদিন গিয়াছিলেন। কিন্তু সে শিক্ষা নামমাত্র। বিশেষতঃ বাল্যকালে তাঁহার প্রকৃতি স্বচ্ছন্দবিহারপ্রিয় ও চঞ্চল ছিল। কোন দিন পাঠশালে লিখিতে যাইবার অনিচ্ছা হইলে কেহই তাঁহাকে পাঠাইতে পারিত না। একদিন তিনি গুরুমহাশয়ের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত বাটীর ভগ্নকূপে নামিয়া লুকাইয়া ছিলেন; বহু অনুসন্ধানে কেহই তাঁহাকে খুজিয়া পায় নাই। অবশেষে সর্দ্দারছাত্রেরা চলিয়া গেলে বেলাবসানে তিনি কূপ হইতে উঠিয়াছিলেন। তৎকালে লেখা-পড়ার চর্চ্চা অধিক ছিল না। গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় অক্ষর পরিচয় হইয়া ধারাপাত, সাঙ্কেতিক, শুভঙ্করের আর্য্যা অভ্যস্ত ও মাস-মাহিনা, সুদ-কষা, মনকষা, প্রভৃতি আয়ত্ত হইলেই তখনকার ছাত্রদের শিক্ষার পরিসমাপ্তি হইত। হস্তাক্ষর সুন্দর হইলে ত জীবিকানির্ব্বাহের আর ভাবনাই ছিল না। সে সময়ে সকলে অল্পেই সন্তুষ্ট থাকিত। খাদ্যদ্রব্য মহার্ঘ্য ছিল না। সামান্য আয়ের দ্বারা স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্ব্বাহ হইত। বলা

বাহুল্য, পরস্নেহে ও পর-অন্নে প্রতিপালিত কাঙ্গাল হরিনাথের শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। তিনি তাঁহার আত্ম-জীবন-চরিতে লিখিয়াছেন —"এই সময়ে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মজুমদার মহাশয় একটী ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। অধ্যয়নের নিমিত্ত তাহাতে প্রবেশ করিলাম। প্রতিপালিকা খুল্লপিতামহী আর্য্যা অবীরা, সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তিহীনা। অগত্যা মধ্যম-জ্যেঠামহাশয় দুটী অন্ন দিতে লাগিলেন। আমি কি করিব, জামিরদিয়ার কুঠিতে খুল্লতাত মহাশয়কে লিখিলাম। তিনি বেতন দিতে স্বীকার করিয়া স্কুলে পড়িতে বলিলেন। স্কুলে প্রবেশ করিয়া রীতিমত অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম। ভিক্ষাদেবী পুস্তক সংগ্রহ করিয়া দিতে লাগি-লেন। কোন কোন পাঠ্যপুস্তকের অভাব নকল করিয়া পূরণ করিতাম। আবার সহপাঠীদের অবসর সময়ে কোন কোন পুস্তক লইয়াও পাঠ অভ্যাস করিতাম। এ দিকে কুঠি বন্ধ হওয়ায় খুড়ামহাশয়ের চাকুরী গেল। তিনি আর বেতন দিতে স্বীকার করিলেন না। অর্থাভাবে লেখাপড়াও বন্ধ হইল।" এই সময়ে তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রের এতই অভাব হইয়াছিল যে, তিনি গৃহের বাহির হইতে সঙ্কুচিত হইতেন। সেই সময়ে কোন ধনী কুণ্ডু মহাশয়ের একখানি পুস্তক নকল করিয়া দিয়া তিনি একখানি নূতন বস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন।

অনন্যোপায় কাঙ্গাল হরিনাথ গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত কোন বিশিষ্ট মহা-জনের দোকানে খাতা-লেখকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। কিন্তু সে কার্য্যে অধিক দিন তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারেন নাই। কোন ঘটনাসূত্রে হরিনাথ তাঁহাদের অভিপ্রায় মত কার্য্য না করায় দোকানের কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় অসন্তুষ্ট হইয়া যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা পূর্ব্বক তাঁহাকে তাড়াইয়া দেন। তিনি এই ঘটনা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"এই ঘটনার পর জ্যেঠামহাশয় দু'বেলা যে দুটী অন্ন দিতেন, সে অন্নের বরাতও উঠিয়া গেল। এখন

আমি যথার্থই অন্নবস্ত্রহীন পথের কাঙ্গাল। প্রতিপালিকা খুল্লপিতামহী কখন তাঁহার উদরান্নের অর্দ্ধাংশ প্রদান করেন, কখন কোন ঠাকুরবাড়ীর প্রসাদে একবেলা উদর পূর্ণ করি। * * * আমার বন্ধু দাদা লোকনাথ কুণ্ডী রাত্রিকালে প্রায়ই আহার দান করিতেন।" খুল্লপিতামহীর অন্নের উপকরণের কথাও একস্থানে লিখিয়াছেন—"পান্তাভাত, জামিরের পাতা, আর লবণ।"

কাঙ্গাল হরিনাথ শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই। যাহা কিছু সামান্য শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন তাহা দ্বারা জ্ঞানলাভের সহায়তা হয় নাই। এই সময় ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্যদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কুমারখালি প্রদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য পণ্ডিত দয়ালচাঁদ শিরোমণি মহাশয়কে প্রেরণ করিয়াছিলেন। হরিনাথ, শিরোমণি মহাশয়ের নিকট কিছু ব্যাকরণ পাঠ করিতে লাগিলেন এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও তৎকালে প্রকাশিত ব্রাহ্মধর্ম্মের কতিপয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই সময়েই, তাঁহার যাহা কিছু ভাষাজ্ঞান হইয়াছিল। তিনি নিজে জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে পারেন নাই, তজ্জন্য তাঁহার মনে ক্ষোভ ও আক্ষেপ ছিল। তাই দেশের বালকদিগের শিক্ষার জন্য ১৮৫৪ খ্রীঃ ১৩ই জানুয়ারি একটী বাংলা পাঠশালা স্থাপন করিয়া বালকদিগের বিদ্যাশিক্ষার পথ সুগম করিয়া দেন। সে সময়ে গুরুমহাশয়ের পাঠশালার শিক্ষাই চরম ছিল, আধুনিক ভাবে বালাংশিক্ষার পদ্ধতি প্রচলিত হয় নাই। কাঙ্গাল হরিনাথই তাঁহার অলোক-সামান্য প্রতিভাবলে ইংরাজী-শিক্ষার পদ্ধতি অনুসারে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় সাহিত্য, ব্যাকরণ, ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া নিজে অবৈতনিক শিক্ষার ভার গ্রহণ পূর্ব্বক বালকদিগকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার যে সকল বিষয় অধীত ছিল না, তাহা গৃহে বাল্যসখা পরলোকগত মথুরানাথ মৈত্রেয় (সাহিত্যক্ষেত্রে

সুপ্রতিষ্ঠ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের পিতা ) মহাশয়ের নিকট শিক্ষা ও অভ্যাস করিয়া বালকদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তখন গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক শিক্ষক প্রস্তুতের জন্য কেবল ২।১টী নর্ম্মাল স্কুল স্থানে স্থানে স্থাপিত হইয়াছিল। কাঙ্গাল হরিনাথের শিক্ষাপদ্ধতির উপকারিতা স্থানীয় ব্যক্তি-গণ উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। বালকদিগের পরীক্ষা করিয়া পরীক্ষক-গণও সন্তুষ্ট হইলেন। এই সময়ে স্থানীয় কতিপয় সদাশয় ব্যক্তি স্কুল পরি-চালনের ভার গ্রহণ করিয়া পরলোকগত যাদবচন্দ্র কুণ্ডু মহাশয়কে সম্পা-দকের পদ প্রদান করেন এবং মাসিক চাঁদা সংগ্রহ করিয়া কমিটী কাঙ্গাল হরিনাথের জলপানি ৬৲ ছয় টাকা স্থির করিয়া দেন। যাঁহার মাথা রাখি-বার স্থান ছিল না, পর-অন্নে যাঁহার জীবন রক্ষা হইত এবং পর গৃহে যাঁহার বাস, বিধাতাপুরুষ এমন একজন অসহায় নিঃসম্বল লোকের দ্বারা এইরূপ আশ্চার্য্য লীলা করিতে লাগিলেন।

পরিদর্শকরূপে যিনি বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পরীক্ষা করিয়াছেন, তিনিই কাঙ্গাল হরিনাথের শিক্ষাদান-পদ্ধতির সাধুবাদ করিয়াছেন এবং সাহিত্য, ইতিহাস ও ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে ছাত্রদিগের পারদর্শিতা দেখিয়া পরিদর্শন-পুস্তকে যথোচিত সুখ্যাতি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ছাত্রসংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, বিদ্যালয়ের আয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। স্কুল-কমিটী তাঁহার “ভাতা” বৃদ্ধি করিয়া ১২৲ টাকা করিয়া দিলেন।

এই সময়ে ইংরাজী ও বাংলা বিদ্যালয়ের সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করিয়া গভর্ণমেণ্ট পাঠশালার ইনস্পেক্টর ও সহকারী ইনস্পেক্টর নিযুক্ত করেন। সহকারী তত্ত্বাবধায়ক বা ইনস্পেক্টর নীলমণি সেন মহাশয় কুমারখালি আসিয়া বাংলা পাঠশালার ছাত্রদিগের পরীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক সাহায্য প্রাপ্তির অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করিলেন। তদনুসারে দরখাস্ত প্রেরিত হইলে অল্পদিন মধ্যেই গবর্ণমেণ্টের সাহায্যদান স্বীকৃত হইয়া আসিল। কমিটী

কাঙ্গাল হরিনাথের বেতন ২০৲টাকা স্থির করিলেন। কিন্তু তিনি নিজে কুড়ি টাকা গ্রহণ করিলে নিম্নশ্রেণীর শিক্ষকদিগের বেতন-বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না, এই বিবেচনা করিয়া হরিনাথ নিজে ১৫৲ টাকা বেতন গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট টাকা নিম্নতন শিক্ষকগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া সুখী হইলেন। দুঃখ কষ্টে যাঁহার জীবন গঠিত, তাঁহার জীবনে এরূপ নিঃস্বার্থ ত্যাগ-স্বীকার আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কি ? কাঙ্গাল হরিনাথ আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন "আমি বিশ টাকা গ্রহণ করিলে, নিম্নশ্রেণীস্থ শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না। আমি পনের টাকা গ্রহণ করিয়া নিম্নশ্রেণীস্থ শিক্ষক-দিগের যথাযোগ্য বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়া সুখী হইলাম। এই পনের টাকা পর্য্যন্তই আমার জীবনের বৈতনিক উপার্জ্জন।"

গ্রামের যে সকল বালক লেখাপড়া ত্যাগ করিয়া গুণ্ডার দলে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদের হিতার্থে কাঙ্গাল হরিনাথ ও তাঁহার বাল্যসখা মথুরা-নাথ বাটীর চণ্ডীমণ্ডপে পঠন-সমিতি ও নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। প্রতি শনিবার চারি ঘটিকার পর সমিতির কার্য্য হইত। পূর্ব্ব সমিতিতে যে প্রশ্ন থাকিত, তদনুসারে প্রবন্ধ লিখিয়া পর সমিতিতে সভ্যগণ পাঠ করিয়া তাঁহাদের প্রদান করিত। কাঙ্গাল হরিনাথ ও সখা মথুরানাথ তাহা সংশোধন করিয়া পর সমিতিতে প্রত্যর্পণ করিতেন। ইহাতে সভ্যগণের প্রবন্ধ লিখিবার অনুরাগের সঙ্গে সঙ্গে ভাল ভাল পুস্তক পাঠের প্রবৃত্তি বলবতী এবং ক্রমে শুদ্ধাশুদ্ধ বোধ ও লিখিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। সমিতি প্রভাকর, এডুকেশন গেজেট প্রভৃতি যে সমস্ত সংবাদপত্র গ্রহণ করিতেন, সভ্যগণ পালাক্রমে তাহাও পাঠ করিতেন। ইহাতে সভ্যগণের পুস্তক অধ্যয়নের ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাষাজ্ঞানও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এইরূপে অনেকে গুণ্ডার দল পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাজের লোক হইয়া পরবর্ত্তী কালে যশঃ ও অর্থোপার্জ্জন করিয়া

সুখী হইয়াছিলেন। নৈশ-বিদ্যালয়ের কার্য্য প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে আরম্ভ হইত। হরিনাথের সখা মথুরানাথ ও গোপালচন্দ্র সান্যাল ইংরাজী, এবং স্বয়ং হরিনাথ বাংলা পড়াইতেন। এই নৈশ-বিদ্যালয়ে পড়িয়া অনেকে ইংরাজী স্কুলে প্রবেশ করিয়া প্রশংসার সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

কাঙ্গাল হরিনাথের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা বালকদিগের শিক্ষা বিধানেই পর্য্যবসিত হয় নাই। তিনি বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য বালিকাস্কুলও স্থাপিত করেন। সে সময়ে স্ত্রী-শিক্ষার নামে সকলেই আতঙ্কিত হইতেন। স্ত্রীলোক বিদ্যা-শিক্ষা করিলে বিধবা হয়, ভ্রষ্ট-চরিত্রা হইয়া সমাজ কলঙ্কিত করে, ইত্যাদি অমূলক বিশ্বাস শিক্ষিতপ্রধান রাজধানীতেই যখন বিদ্যমান ছিল, তখন পাড়াগাঁয়ের ত কথাই নাই। কাঙ্গাল হরিনাথের অদম্য তেজ ও উৎসাহ কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইতে জানিত না। সংসারে বাস করিতে হইলে সমাজ ভিন্ন মানুষ বাস করিতে পারে না। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই সমাজের অঙ্গ বিশেষ। সমাজের এক অঙ্গকে যদি শিক্ষার দ্বারা উন্নত করা হয়, এবং অপর অঙ্গ শিক্ষার অভাবে অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে, তাহা হইলে সে সমাজের কখনই সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইতে পারে না। সমাজের মঙ্গলের জন্য যেমন বালক-শিক্ষার প্রয়োজন, তদ্রূপ বালিকা-শিক্ষারও প্রয়োজন। কাঙ্গাল হরিনাথ সমাজের সেই অভাব মোচনের নিমিত্ত কয়েকটি বালিকা লইয়া নিজ বাটীর চণ্ডীমণ্ডপগৃহে বালিকাশিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন এবং নিজেই শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার শিক্ষার এমন আশ্চর্য্য শক্তি ছিল যে, বালিকাদিগের বিদ্যা ও জ্ঞানে ঐকান্তিক ভক্তি চিরদিন সমান ছিল। তাঁহারা যখন পিতৃগৃহে আসিতেন, পিতৃ-মাতৃ স্নেহের ন্যায় শিক্ষকের স্নেহ ভুলিতে না পারিয়া, অনেকেই শিক্ষকের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ

করিতে তাঁহার গৃহে আসিতেন। তাঁহার কীর্ত্তিস্বরূপ উভয় বিদ্যালয় এখনও বর্ত্তমান থাকিয়া, বালকবালিকাগণের শিক্ষার সহায়তা করিতেছে।

সে সময়ে এ প্রদেশে নীলকরেরা প্রজাদিগের প্রতি অসহ্য অত্যাচার আরম্ভ করায়, নীলবিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। তখন হরিনাথের সখা মথুরানাথ "হিন্দু-পেট্রিয়টে" সেই সকল ঘটনা লিখিতে আরম্ভ করেন। প্রজাহিতৈষী "হিন্দু পেট্রিয়ট" সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র তাহা আদর করিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। কাঙ্গাল হরিনাথ প্রজার প্রতি নীলকরের অত্যাচার কাহিনী "সংবাদ প্রভাকরে" লিখিতে আরম্ভ করিলেন। উভয়ের লিখিবার বিষয় একই ছিল, কেবল ইংরাজী ও বাংলা ভাষা এই মাত্র প্রভেদ। কাঙ্গাল আত্মজীবন-চরিতে লিখিয়াছেন, "সাধ্য ততদূর না থাকুক, প্রজার প্রতি নীলকরের অত্যাচার যাহাতে নিবারিত হয়, তাহার উপায় চিন্তাকরণ মথুরের ও আমার নিত্যব্রত ছিল।"

বাঙ্গালাসংবাদপত্র অনুবাদ করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাহার মর্ম্ম অবগত হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, এবং তজ্জন্য একটী স্বতন্ত্র কার্য্যালয় স্থাপিত হইতেছে, কাঙ্গাল হরিনাথ ইহা শুনিয়া বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়া দীন দুঃখী প্রজার প্রতি সবলের অত্যাচারকাহিনী রাজার কর্ণগোচর করিবেন, এই ইচ্ছার একান্ত বশবর্ত্তী হইলেন। তিনি আত্মজীবনচরিতে লিখিয়াছেন, "ঘরে নাই এক কড়া, তবু নাচে নায় পাড়া। আমার ইচ্ছা হইল এই সময় একখানি সংবাদপত্র প্রচার করিয়া গ্রামবাসী প্রজারা যেরূপে অত্যাচারিত হইতেছে, তাহা গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর করিলে অবশ্যই তাহার প্রতিকার, এবং তাহাদিগের নানা প্রকার উপকার সাধিত হইবে। সেই ইচ্ছাতেই গ্রাম ও পল্লীবাসী প্রজার অবস্থা প্রকাশ করিব বলিয়া পত্রিকার নাম 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' রাখি। গিরিশযন্ত্রের কর্ত্তা

গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ইহার জন্য একটী শিরোমুকুট বা হেডিং এবং একটী শ্লোক প্রস্তুত করাইতে প্রতিশ্রুত করাইলাম।"

"গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা" সংবাদ পত্রিকা দ্বারা গ্রামের অত্যাচার নিবারিত ও গ্রামবাসীদিগের নানাপ্রকার উপকার সাধিত হইবে, তৎসঙ্গে মাতা বঙ্গভাষাও সেবিতা হইবেন, ইত্যাদি নানাপ্রকার আশা করিয়া ১২৭০ সালে গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মাসিক চারিফর্ম্মা করিয়া "গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা" প্রকাশ আরম্ভ করিলেন।

সংবাদপত্রের আদিযুগে একজন দরিদ্র নিঃসম্বল অসহায় দীন হীন কাঙ্গাল, বিধিদত্ত অতুল প্রতিভা ও ঐশীশক্তি বলে দেশের জন্য, দশের সেবার জন্য এইরূপ বহুব্যয়সাধ্য সংবাদপত্রের প্রচারে ব্রতী হন। বিশেষতঃ তখন নিজের বা মফঃস্বলের কোথাও মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। কলিকাতায় যাতায়াতেরও তখন সুবিধা ছিল না। কারণ পূর্ব্ববঙ্গের রেলপথ তখনও খোলা হয় নাই। সেই সময়ে কলিকাতায় সংবাদপত্র মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করা অসম সাহসের পরিচয়। তখন সাধারণে সংবাদপত্র বড় পড়িত না, এবং সংবাদপত্র কি তাহাও জানিত না; সংবাদপত্রের মূল্যও অত্যধিক থাকায় ধনী ভিন্ন সাধারণের তাহা গ্রহণ করিবার সামর্থ্য ছিল না। সেই কারণে সংবাদপত্রের কথা সাধারণে পরিজ্ঞাত ছিল না। কাঙ্গাল হরিনাথ ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া, এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন।

গ্রামবার্ত্তার প্রবন্ধাদি ও প্রেরিত পত্রের সংবাদ প্রভৃতির বিচার ও সংশোধন করিয়া চারি ফর্ম্মার উপযুক্ত আদর্শলিপি অর্থাৎ কাপি নিজহাতে লিখিয়া যথাসময়ে মুদ্রাযন্ত্রালয়ে প্রেরণ করা বহু সময়ের আবশ্যক। তাহার পর মূল্যাদি আদায়, অন্যান্য কারণে গ্রাহক এবং পত্র-প্রেরক নানালোকের নিকটে পত্রাদি লিখিতে অনেক সময় ব্যয় হইত। কাজেই তিনি বাধ্য হইয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা পরিত্যাগ করেন। বিদ্যালয়ের প্রাপ্য বেতন

তাঁহার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের প্রধান অবলম্বন ছিল। গ্রামবার্ত্তার এরূপ আয় হয় নাই, যাহা দ্বারা তিনি সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারেন। সুতরাং অতি কষ্টে সংসারের ব্যয়নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। তিন বৎসর এইরূপে অতিবাহিত হইল। চতুর্থ বৎসরে চিঠিপত্র লিখিয়া মূল্যাদি আদায় করা ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠিল। এই সময়ে তিনি একদিনের দুইদিনের দূরবর্ত্তী স্থানে নিজেই গমন করিয়া মূল্য আদায় করিতে লাগিলেন। তিনি আত্মজীবনচরিতে লিখিয়াছেন—"এই সময় আমিই লেখক, আমিই সম্পাদক, আমিই পত্রিকা-লিপিকারক ও বিলিকারক, এবং আমিই মূল্য আদায়কারী অর্থ-সংগ্রাহক।" আজকালকার সম্পাদক বা সংবাদপত্রের সত্বাধিকারিগণ কাঙ্গাল হরিনাথের এই যত্ন ও চেষ্টার কথা মনে ধারণা করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। এখন উপহারের অনুগ্রহে মূল্য অগ্রিম আদায় হইতেছে। বাকী আদায়ের ভাবনা তাঁহাদের নাই।

এই সময় একদিন মুদ্রাযন্ত্রের অধ্যক্ষ পত্র লিখিলেন যে, "২।৩ দিনের মধ্যে পূর্ব্ব-প্রাপ্য, না পাইলে আর গ্রামবার্ত্তা ছাপা করিতে পারিব না।" পত্র পড়িয়া হরিনাথ নিজ জীবনচরিতে লিখিয়াছেন—"পত্রপাঠ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহ মস্তক ঘূর্ণিত হইল। ছয়দণ্ড রবি থাকিতে পদব্রজে গমন করিয়া কুষ্টিয়ায় প্রাতঃকালে উপস্থিত হইলাম। তথায় যাহা কিছু আদায় হইল, তাহা হস্তগত করিয়া পদ্মা-পারে চলিলাম। তথায় যাহা আদায় হইল গ্রহণ পূর্ব্বক ছয়দণ্ড একপ্রহর বেলা থাকিতে প্রতিগমন করিয়া রাত্রিতে বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই দিন চৈত্রমাসের দুপ্রহরের রৌদ্রের সময় পদ্মার তীরস্থ তাপিত বালুকাময়ী চড়া অতিক্রম করিতে পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ ও রৌদ্রতাপে তাপিত হইয়া যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলাম, যদি গ্রামবার্ত্তার প্রতি প্রেমানুরাগ সঞ্চিত না থাকিত, তবে তাহা তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগের কারণ হইত।"

গ্রামবার্ত্তা প্রথমে মাসিক, পরে পাক্ষিক, এবং অবশেষে সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হইয়াছিল। ১২৮০ সালে কুমারখালিতে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইলে, গ্রামবার্ত্তা কুমারখালিতে নিজ মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে লাগিল। গ্রামবার্ত্তা দ্বারা এ প্রদেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছিল। ইহা যে কেবল জমিদারের মহাজনের এবং নীলকুঠির অত্যাচার নিবারণের মুষ্টিযোগ স্বরূপ হইয়াছে তাহা নহে, প্রজার প্রতি রাজার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ থাকিত তদনুসারে কার্য্য করিতে গবর্ণমেণ্টেরও যথেষ্ট অনুরাগ লক্ষিত হইত। বাংলা গবর্ণমেণ্টের বাংলাসংবাদপত্রের অনুবাদক মিঃ রবিন্সন্ সাহেব বাহাদুর স্বয়ং বিদ্যারত্ন যন্ত্রে উপনীত হইয়া "গ্রামবার্ত্তা" গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং গবর্ণমেণ্টের গোচরার্থে গ্রামবার্ত্তা হইতে যে সকল অনুবাদ করিতেন, তাহাতে গ্রাম ও পল্লীবাসী নিরীহ দুঃখী প্রজার বিস্তর উপকার সাধিত হইয়াছিল। নদী খাল প্রভৃতি পয়ঃপ্রণালী সংস্কার পূর্ব্বক জলকষ্ট নিবারণ, পুলিশ-বিভাগের সংস্কার ব্যবস্থা, গো-ধন রক্ষা, রেলপথদ্বারা জলনিঃসরণের পথবদ্ধ হওয়ায় এদেশ যে অস্বাস্থ্যকর ও ম্যালেরিয়ার আকরভূমি হইতেছে, পোষ্টাফিসের মনি অর্ডার প্রথাপ্রচলন প্রভৃতি অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে হরিনাথ লেখনী পরিচালনা করিয়া রাজা ও প্রজা উভয়েরই হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তৎকালে "সোমপ্রকাশ" ও "গ্রামবার্ত্তাই" উচ্চশ্রেণীর সাময়িক পত্র ছিল।

এই সমস্ত গুরুতর পরিশ্রমে এবং বিবিধপ্রকার চিন্তায় তাঁহার মস্তিষ্কের পীড়া জন্মে। একে ত গ্রামবার্ত্তার ব্যয়ভারে বিব্রত হইয়া পড়েন, তাহার উপর তাঁহার প্রিয়তম পাঠশালার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হওয়ায় তাহাও ঋণজালে জড়িত হইয়া উঠিয়া যাইবার উপক্রম হয়। বিদ্যালয়ের অবস্থা বেশ উন্নত হইলে, তিনি উহার সম্পাদকের ভার অন্যের হস্তে অর্পণ করেন। এখন বিপদ দেখিয়া সম্পাদক মহাশয়

বলিলেন,—"আমি কেবল নামে সম্পাদক আছি, ইহার শুভাশুভ ভার চিরকাল তোমার উপর ন্যস্ত আছে। অতএব তুমিই ইহার উপায় উদ্ভাবন কর।" বিপদ দেখিয়া কাঙ্গাল হরিনাথ অন্য লোকের ন্যায় পশ্চাৎপদ হইতে জানিতেন না। তিনি শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা সত্ত্বেও বিদ্যালয়ের ভার লইয়া তিনজন শিক্ষকের কার্য্য একাকী নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাঁহাকে নিয়মিত পরিশ্রম করিতে হইত, কিন্তু তিনি পরোপকার এবং স্বদেশের সেবারূপ যে মহৎ ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারই অনুরোধে নিজের সর্ব্বপ্রকার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য তুচ্ছ করিয়া, পরিপূর্ণ উৎসাহের সহিত অভীষ্ট পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অবিলম্বেই তাঁহার পাঠশালা ঋণমুক্ত হইয়া অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল অবস্থা লাভ করিল। কিন্তু এই সংগ্রামে তাঁহাকে অস্ত্রাহত বিজয়ী বীরের ন্যায় শয্যাশায়ী হইতে হইল।

ভগবানের কৃপায় তিনি অল্পদিনের মধ্যেই রোগমুক্ত হইয়া, অধিকতর যত্নের সহিত গ্রামবার্ত্তা পরিচালনে রত হইলেন। অধিক মূল্য দিয়া পল্লীবাসী সংবাদপত্র গ্রহণে অসমর্থ ভাবিয়া, তিনি গ্রামবার্ত্তার মূল্য ৫ এক পয়সা নির্দ্ধারিত করিলেন। এত সুলভ মূল্যে সংবাদপত্র বাহির করা তখন স্বপ্নের অগোচর ছিল, কারণ ইহার অনেকগুণ মূল্য দিয়াও সংবাদপত্র গ্রহণ করা সহজ ছিল না। কাঙ্গাল হরিনাথ অল্পমূল্যে গ্রামবার্ত্তা প্রচার করিয়া সাধারণলোকের মধ্যে শিক্ষার পথ সুগম করিয়াছিলেন। গ্রামবার্ত্তার মূল্য সুলভ করায়, তিনি অনেক টাকার ঋণজালে জড়িত হন। কাঙ্গাল হরিনাথ গ্রাহকবর্গের নিকট যথোচিত উৎসাহ এবং সাহায্য লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি যাহাদের জন্য খাটিয়া মরিতেন, যাহাদের বিপদ দূর করিতে গিয়া নিজে বিপদের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেন, তাহারা পর্য্যন্ত তাঁহার সাধু-উদ্দেশ্যে উপেক্ষা প্রকাশ করিত। ইহা অপেক্ষা

আমাদের দেশের লোকের আর কি অধিক কলঙ্ক হইতে পারে! যাঁহারা আমাদের জন্য প্রাণপাত করেন, জীবিতাবস্থায় একবার তাঁহার দিকে ফিরিয়াও চাহি না। অবশেষে তাঁহারা ইহজীবন ত্যাগ করিয়া নিন্দা বা প্রশংসার অনেক উর্দ্ধদেশে চলিয়া গেলে, আমরা তাঁহাদের জন্য সভা করি এবং বক্তৃতাপূর্ব্বক বিলাপ করিতে থাকি। সাধারণহিতকরকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া, দেশের সেবা করিতে গিয়া, হরিনাথকে সমূহ বিপদজালে জড়িত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু কোন বিপদেই হরিনাথকে কাতর ও অধীর করিতে পারে নাই। এই সময়ে তিনি নির্ভীকভাবে তেজস্বিতার সহিত গ্রামবার্ত্তা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

চতুর্থ বর্ষের শেষভাগে তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, যে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য ফুরায় নাই, তাঁহার আরও অনেক বলিবার আছে। যখন শ্রোতৃবর্গ অনেক পরিমাণে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, যখন তাঁহাদের হৃদয় ক্রমশঃ এই সকল গুরুতর বিষয়ে ধারণা করিতে সমর্থ হইতেছিল, তখন উপদেশগুলি আরও মূল্যবান ও মনোরম হইত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেশের অবস্থা, সমাজের অবস্থা প্রভৃতি তিনি কিরূপ পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন এবং কিরূপ বিচক্ষণ দূরদর্শী চিকিৎসকের ন্যায় তিনি তাহার প্রতীকার নির্ণয়ে আপনার চিন্তাশক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন তাহা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে বলিবার অবকাশ হইবে না। সমাজের নিষ্ক্রিয়তা ও অসাড়তা তাঁহাকে ব্যথিত করিল। এদিকে বার্দ্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ঋণভার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। তাহা পরিশোধের অন্য উপায় দেখিলেন না। তখন তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন কৃতবিদ্য সুশিক্ষিত ব্যক্তি এবং এই অধম লেখক গ্রামবার্ত্তা সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়া, কাঙ্গালকে ধর্ম্মচিন্তায় অবসর প্রদান করেন। কিন্তু "নেব" "দেব না", যে দেশের

গ্রাহকগণের সংকল্প, সে দেশে সংবাদপত্র পরিচালন বহু কষ্টসাধ্য। গ্রামবার্ত্তার ঋণ আর পরিশোধিত হইতেছে না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। সেই জন্যই ১৯৬২ সালে আশ্বিন মাসে ২২ বৎসর প্রকাশের পর, গ্রামবার্ত্তা বন্ধ হইয়া যায়! প্রায় ১২০০৲ টাকা মূল্য বাকী থাকিতে ৭০০৲ টাকা ঋণভার গ্রহণ করিয়া, মর্ম্মাহত কাঙ্গাল হরিনাথ সংবাদপত্রের ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, ভগবচ্চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন।

ইহার বহু পূর্ব্বে তাঁহার "বিজয়বসন্ত" প্রকাশিত হইয়াছিল। কাঙ্গাল হরিনাথ যে সময় বাংলা সাহিত্যের সেবায় নিযুক্ত হন, সে সময়ে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস গ্রন্থের সম্পূর্ণ অভাব ছিল। তখন বাহারদানেশ, চাহার দরবেশ, বিদ্যাসুন্দর, কামিনীকুমার প্রভৃতি গ্রন্থই উপন্যাসের স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। সে সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া, পাঠকের মনে কুৎসিত ভাবই উদ্দীপিত হইত। উপন্যাস-সৃষ্টির আদিযুগে সৎ উপন্যাসের অভাব দেখিয়াই হরিনাথ, "বিজয়বসন্ত" রচনা করেন। তখন পদ্যের প্রাদুর্ভাব। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের নানাভাবময়ী রসের কবিতা বঙ্গভাষাকে সজীব রাখিয়াছিল। 'বিজয়বসন্ত' প্রথমে পদ্যে রচিত হয়, কিন্তু তাহা মুদ্রিত হয় না। দয়ারসাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মনস্বী অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়েরা যখন সুললিত গদ্যে পুস্তক প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময় নদীয়াজেলার ক্ষুদ্রতম গ্রাম কুমারখালিতে কাঙ্গাল হরিনাথ "বিজয়বসন্ত" রচনা করেন। তখন বাংলা ভাষায় লিখিত পুস্তক পাঠ করা ইংরাজীশিক্ষিতগণ বিশেষ লজ্জাকর বলিয়া মনে করিতেন। সেই সময়ে ১৮৭১ সালে হরিনাথের "বিজয়বসন্ত" মুদ্রিত হয়। হরিনাথ ইংরাজী জানিতেন না। ইংরাজী কোন ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া পুস্তক লেখা তাঁহার ঘটিয়া উঠে নাই। তিনি বিধিদত্ত অমূল্য প্রতিভাবলে উপন্যাসের সেই আদি যুগে "বিজয়বসন্ত" প্রণয়ন করিয়া, পাঠক-সমাজের মনোরঞ্জনে

সমর্থ হইয়াছিলেন। বলিতে কি কাঙ্গাল হরিনাথের "বিজয়বসন্ত" এই শ্রেণীর উপন্যাসের মধ্যে মৌলিকতা, মধুরতা এবং প্রকৃত কাব্যগুণে মাতৃভাষার যথেষ্ট গৌরব বৃদ্ধি করিয়া বহুজনের আদর লাভ করিয়াছিল। "বিজয়বসন্ত" বঙ্গ-সাহিত্যের বাল্যজীবনে যে লাবণ্যবিকাশ করিয়াছিল, তাহা বঙ্গীয় পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন।

কাঙ্গাল হরিনাথের ন্যায় সর্ব্বজনহিতব্রতে ব্রতী লোক অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল। হরিনাথ স্বভাবকবি ছিলেন। তখন কুমারখালিতে কীর্ত্তনের বড় ধুম ছিল, অনেকেই সুন্দর সুন্দর পদ রচনা করিয়া বিগ্রহের পর্ব্বোপলক্ষে গান করিতেন। এইরূপে সমস্ত রাত্রি সংকীর্ত্তনের প্রাণস্পর্শী সুরে গ্রাম শব্দায়মান হইত। হরিনাথের পদগুলি মহাজন বিরচিত পদাবলী অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিল না। তাঁহার রচিত পদ তিনি নিজেই গান করিয়া সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়া রাখিতেন। অনেকে সেই সকল গান শুনিয়া ভাবে গদ-গদ-হইয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন ও আনন্দে নৃত্য করিতেন। তাঁহার রচিত কবির গান ওস্তাদী দলের গান হইতে কোন অংশেই নিকৃষ্ট ছিল না। বরং বাঁধুনি ও বিষয়-গৌরবে অনেক ওস্তাদ কবির গান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল। এ প্রদেশের অনেক ওস্তাদী দলের সঙ্গে হরিনাথের দলের পাল্লা চলিত। হরিনাথের সঙ্গীতে অশ্লীলতার লেশ মাত্র ছিল না। তাঁহার সংগীতের ইহাই বিশেষত্ব। অনেক বয়োবৃদ্ধের মুখে শুনা যায়, এইরূপ পাল্লাপাল্লিতে সমস্ত রাত্রি কাটিয়া যাইত। জয়পরাজয় সহজে স্থির হইত না। পরিশেষে হরিনাথের দলই জয়মাল্য গ্রহণ করিত। তাঁহার সখীসংবাদ ও আগমনী ২।১টী গান লোকমুখে যাহা শুনা যায়, পদলালিত্যে ও কবিত্বে তাহা শ্রেষ্ঠ আসন লাভের যোগ্য। দুঃখের বিষয় গানগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বহু অনুসন্ধানেও ২।৪টী সঙ্গীত ভিন্ন অধিক প্রাপ্ত

শ্রীজলধর সেন

হই নাই। তাঁহার ব্রহ্মসঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন প্রাণস্পর্শী। এই সকল ভক্তিপূর্ণ সঙ্গীতের আকর্ষণে উপাসকমাত্রেই মুগ্ধ হইতেন। কাঙ্গাল-হরিনাথের নাম-সংকীর্ত্তনে অনেকের নয়নে প্রেমাশ্রুধারা বহিয়া থাকে। এখনও তাঁহার নাম-সংকীর্ত্তনের পদ শ্রবণ করিবার জন্য কত লোকে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে। ভবানী ও মাতৃবিষয়ক সঙ্গীতগুলিও তাঁহার অপূর্ব্ব সৃষ্টি—ভক্ত সাধকের আদরের সামগ্রী।

গ্রামের যুবকগণ যাহাতে নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগ করিয়া সময় অতিবাহিত করিতে পারেন, সেইজন্য হরিনাথ অনেকগুলি পৌরাণিক নাটক, যাত্রা, পাঁচালী ও কীর্ত্তন রচনা করিয়া নিজেই শিক্ষার ভার গ্রহণ-পূর্ব্বক যুবকগণের দ্বারা সেই সকল নাটক ও যাত্রার অভিনয় করাইতেন। কখন বা পাঁচালীর দল করিয়া গান করিতেন। ইহাতে যেমন যুবক-গণের হৃদয়ে নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগের স্পৃহা উত্তেজিত হইত, তেমনই গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা পৌরাণিক পবিত্র ইতিহাসের অভিনয় দর্শন করিয়া নয়ন মন চরিতার্থ করিতেন। ধর্ম্মপ্রাণ হরিনাথ এইরূপে দেশের মধ্যে ধর্ম্মের ভাব ও সুনীতি বিস্তারের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন। তাঁহার কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের বাউল সঙ্গীতে সমস্ত বঙ্গদেশ মাতিয়া উঠিয়াছিল।

কাঙ্গাল-হরিনাথ, পূর্ব্ববঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতার নিকটে তাঁহার বাউল সঙ্গীতের দ্বারাই অসামান্য লোক বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। এই বাউল সঙ্গীতের সহজ সরল প্রাণস্পর্শী কথায় শিক্ষিত অশিক্ষিত সর্ব্ব-শ্রেণীর লোকই মুগ্ধ হইতেন। অল্পদিন মধ্যে বাউল সঙ্গীতের মধুর উদাস-সুর হাটে, ঘাটে, মাঠে, নৌকাপথে সর্ব্বত্রই শ্রুত হইত। এখনও রাখাল বালক সন্ধ্যাকালে ক্লান্তদেহে গোচারণ-ক্ষেত্র হইতে ফিরিতে ফিরিতে উচ্চকণ্ঠে চতুর্দ্দিক প্লাবিত ও সান্ধ্য-আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া গাইতে থাকে,—

"আমি ক'রব এ রাখালি কত কাল।
পালের ছয়টা গরু ছুটে কর্‌ছে আমায় হাল বেহাল।"

অথবা

"ওহে দিন্ ত গেল, সন্ধ্যা হ'ল, পার কর আমারে।
তুমি পারের কর্ত্তা, শুনি বার্ত্তা, ডাক্‌ছি হে তোমারে।"

এখনও বর্ষার রাত্রে কুলপ্লাবী পদ্মার বিশাল বক্ষে উন্মত্ত-তরঙ্গভঙ্গ-চঞ্চল ক্ষুদ্র ডিঙ্গীখানিতে বসিয়া, জেলেমাঝী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গাহিয়া উঠে,—

"কে যাবি মাছ ধরিতে, আয় রে ভাই আমার সাথে।"

দিগ্‌দিগন্ত তাহার কণ্ঠস্বরে আকুল হইয়া যেন ক্ষণকালের জন্য পদ্মার প্রশস্ত বক্ষে মানুষের ক্ষণভঙ্গুর ইহজীবনের পরপারে এক অনন্ত নবজীবনের অস্তিত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। অনেক সঙ্গীতে সংসারের অনেক সুখদুঃখের কথা ধ্বনিত হইয়াছে বটে, কিন্তু কাঙ্গাল হরিনাথের বাউল সঙ্গীতে হৃদয়ের মধ্যে যেমন সংসারের অনিত্যতা, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, ভক্তি ও প্রেমভাব জাগাইয়া তুলে, এমন আর কিছুতেই নহে। রূপের গর্ব্ব, ঐশ্বর্য্যের অভিমান, বাসনার আসক্তি হইতে মানুষ আপনাকে যদি নির্ম্মুক্ত করিতে চাহে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে হরিনাথের সঙ্গীত এক অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ। ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, রাজসাহী, রঙ্গপুর প্রভৃতি জেলার অনেক লোকই কাঙ্গাল হরিনাথের এই সকল সাধন-সঙ্গীত শ্রবণে মনে করিতেন হরিনাথ দেবতা। সঙ্গীত উপলক্ষে কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ যখন যে স্থানে গমন করিয়াছেন, তখনই সেইস্থান হরিনাথের বাউল সঙ্গীতের পবিত্র স্রোতে প্লাবিত হইয়া গিয়াছে।

তাঁহার সঙ্গীতের ভাষায় নির্ভরশীল ভক্ত হৃদয়ের শান্ত মধুরভাব আপনা হইতেই উদ্বেলিত হইয়া উঠে। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, হরিনাথ বাল্য-কালেই পিতৃমাতৃহীন হন। সুতরাং পিতৃস্নেহের জন্য যে আজন্ম-সঞ্চিত

পিপাসা তাঁহার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে ফল্গুপ্রবাহের ন্যায় নিয়ত প্রবাহিত হইত, সেই গভীর অনুরাগ অবশেষে এক অনাদি অনন্ত বিশ্বজননীর প্রেমে বিলীন হইয়া যায়। তাই দুঃখ, কষ্ট, শোকতাপে তাপিত নরনারী তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণে ক্ষণকালের জন্য সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা ভুলিয়া, মনে করে—মাতৃস্নেহের মত সে যেন কি একটা সুশীতল দ্রব্যের সান্নিধ্য লাভ করিয়াছে। বঙ্গসাহিত্যকে সমুজ্জ্বল করিবার জন্য তাঁহার পবিত্র লেখনীপ্রসূত বহু পুস্তকাদি বিদ্যমান থাকিলেও, একমাত্র সঙ্গীতেই কাঙ্গাল ফিকির অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। অসংখ্য নরনারী এখনও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে যে তাঁহার নাম করে, তাঁহার সঙ্গীতই তাহার কারণ। একদিকে তিনি যেমন নিরাশ্রয় প্রপীড়িত দীনদরিদ্রের জন্য প্রাণপণে অত্যাচারের বিরুদ্ধে মহাসংগ্রাম করিতেন, অপর দিকে তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত স্বরচিত পবিত্রগীতিস্রোতে দুঃখ-দৈন্য-শোক-তাপ সমস্তই ভাসিয়া যাইত। সহস্র সহস্র শ্রোতা পুত্তলিকার মত স্থিরভাবে অতৃপ্ত-হৃদয়ে তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীতসুধা পান করিত এবং নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিত।

বার্দ্ধক্যে হরিনাথ অধিকাংশ সময়ই ধর্ম্মচিন্তায় নিযুক্ত থাকিতেন। সংসারচিন্তা, অন্নকষ্ট কিছুই তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিত না। পরের উপকার করা তাঁহার জীবনের কার্য্য ছিল, অন্তিম মুহূর্ত্তেও সেই পরম পবিত্র ব্রত পালনে তিনি উদাসীন হন নাই। দুঃখী, তাপী, অনাথ, অসহায় রোগী সকলেই তাঁহার স্নেহ পাইত। তিনি মাতৃহীনের মাতা, বিপন্নের বন্ধু, সম্পন্ন ব্যক্তির সুপরামর্শদাতা এবং কুপথগামী জনগণের সুপথপ্রদর্শক ছিলেন। দাসের ন্যায় তিনি অনাথের সেবা করিতেন। বিপন্ন ব্যক্তি তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া নিরুদ্বেগ হইত। তিনি রোগী ও তাপীর সান্ত্বনার স্থল ছিলেন। হরিনাথ যখন ধীরে ধীরে রোগীর

মস্তক স্পর্শ করিতেন, কুশল জিজ্ঞাসা করিতেন এবং কত আশার কথা বলিতেন, তখন তাহা শুনিতে শুনিতে, রোগীর সেই মৃতপ্রায় দেহে নব-জীবনের সঞ্চার হইত। রোগীর শয্যাপার্শ্বে তাঁহার সেই তেজঃপূর্ণ, উন্নত, সুগৌর দেহ, শ্বেতশ্মশ্রুমণ্ডিত মুখ-মণ্ডল, গৈরিক বস্ত্র, নগ্নপদ এবং পৃষ্ঠ-বিলম্বিত শ্বেতবর্ণ রুক্ষ কেশভার দেখিলে মনে হইত, স্বর্গ হইতে বিধাতা বুঝি কোন দেবদূতকে রোগীর সেবার জন্য পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন।

---

# ফিকিরচাঁদের বাউল সংগীত।

কাঙ্গাল হরিনাথের বিস্তৃত জীবনচরিত লিখিবার জন্য উপকরণের অভাব নাই ; তিনি যে প্রকাণ্ড দিনলিপি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে অনেক বিবরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার বাসগ্রামে এখনও এমন অনেক ব্যক্তি জীবিত আছেন, যাঁহারা কাঙ্গাল হরিনাথের জীবনের অনেক ঘটনা জানেন। এ দীন লেখকও বহুদিন কাঙ্গাল হরিনাথের পাদমূলে বসিয়া যৎকিঞ্চিৎ সাহিত্যশিক্ষা লাভ করিয়াছিল। তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লেখকের পরিচয়ও ছিল। আজ ১৭ বৎসর হইল কাঙ্গাল হরিনাথ সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার জীবনকাহিনী লিখিবার উপকরণের অভাব না থাকিলেও, লেখকের অভাব হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গলাসাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ভায়া কাঙ্গাল হরিনাথের সাহিত্য-শিষ্য। হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারক প্রসিদ্ধ বাগ্মী শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ভায়াও কাঙ্গালের সাহিত্য-শিষ্য। কিন্তু এই জীবনকাহিনী লিখিবার জন্য যে সময়ের প্রয়োজন, তাহা এই দুইজনের একজনও দিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা এত কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের কার্য্যক্ষেত্র এতদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাঁহারা এদিকে মনোযোগ করিতে পারিতেছেন না ; অথচ কাঙ্গাল হরিনাথের জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করা যে অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা তাঁহারাও অস্বীকার করেন না। এ অবস্থায় আমার মত ব্যক্তিকেই এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে। কাঙ্গাল হরিনাথের শিষ্য বলিয়া গৌরব অনুভব করি বটে, কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে বড় অধিক শিক্ষা

করিতে পারি নাই। আমার সাহিত্যচর্চ্চার ব্যর্থ ইতিহাসই তাহার প্রমাণ।

কাঙ্গাল হরিনাথের জীবনের প্রধান কথাগুলি আমি বলিয়াছি। এক্ষণে কাঙ্গালের জীবনের বিশেষ বিশেষ অংশের বিবরণ প্রদান করিব। সর্ব্বাগ্রে কাঙ্গাল হরিনাথের সাহিত্য-সাধনার কথা বলাই কর্ত্তব্য ছিল; কিন্তু আমার মনে হইয়াছে যে, "বিজয়-বসন্তের" প্রণেতা অপেক্ষা ফিকির-চাঁদের গানের জন্যই কাঙ্গাল হরিনাথ অধিকতর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এই কারণেই সংবাদপত্রের সম্পাদক হরিনাথ, সাহিত্য-রথী হরিনাথ, সাধক হরিনাথ,—এ সকল কথা বলিবার পূর্ব্বে কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ হরিনাথের কথাই বলিবার প্রলোভন সংবরণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

ফিকিরচাঁদের বাউলসঙ্গীতের একটু ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে। সামান্য ব্যাপার হইতে কেমন করিয়া বড় ব্যাপার হইয়া থাকে, ইহা তাহারই ইতিহাস।

একবার গ্রীষ্মের অবকাশের সময় শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ভায়া বাড়ীতে ( কুমারখালি ) আসিয়াছেন। তিনি তখন বি, এল পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। আমি তখন স্কুলমাষ্টার। আমারও গ্রীষ্মাবকাশ। আমরা তখন বাড়ীতে আসিয়া কাঙ্গালের বড় সাধের 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' পত্রিকার সম্পাদন করি, আর অবসর সময় অমোদ আহ্লাদে কাটাইয়া দিই।

এই সময়ে একদিন মধ্যাহ্নকালে গ্রীষ্মের জ্বালায় অস্থির হইয়া, গ্রামবার্ত্তার 'কাপি' লেখা পরিত্যাগ করিয়া, আমরা হাত পা ছড়াইয়া, বিশ্রাম করিতেছি। স্থান গ্রামবার্ত্তার আফিস, অর্থাৎ কাঙ্গাল হরিনাথের চণ্ডীমণ্ডপের একটি কক্ষ। উপস্থিত শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার, গ্রামবার্ত্তার

প্রিণ্টার (এক্ষণে পরলোকগত) প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, কুমারখালী বাঙ্গালা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং ছাপাখানার ভূতের দল। ভূতের দল ব্যাকরণ বা সাহিত্যে পণ্ডিত ছিল না, কিন্তু তাহারা সকলেই কাঙ্গালের শিষ্য, সকলেই গান করিতে পারিত। চুপ করিয়া শয়ন করিয়া থাকা আমাদের কাহারও কোষ্ঠীতে লেখে না। সেই দ্বিপ্রহরে রৌদ্রের মধ্যে কি করা যায়, ইহা লইয়াই একটা তর্ক আরম্ভ হইল। তর্ক বেশ চলিতে লাগিল, কিন্তু কর্ত্তব্য স্থির হইল না; তর্কের যাহা গতি হইয়া থাকে তাহাই হইল। অক্ষয় বলিলেন যে, "একটা বাউলের দল করিলে হয় না?" এ কথাটা মনে হইবারও একটা কারণ ঘটিয়াছিল। সে দিন প্রাতঃকালে লালন ফকির নামক একজন ফকির কাঙ্গালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। লালন ফকির কুমারখালীর অদূরবর্ত্তী কালীগঙ্গার তীরে বাস করিতেন। তাঁহার অনেক শিষ্য ছিল। তিনি কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন তাহা বলা বড় কঠিন, কারণ তিনি সকল সম্প্রদায়ের অতীত রাজ্যে পৌঁছিয়াছিলেন। তিনি বক্তৃতা করিতেন না, ধর্ম্মকথাও বলিতেন না। তাঁহার এক অমোঘ অস্ত্র ছিল— তাহা বাউলের গান। তিনি সেই সকল গান করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিতেন। শুনিয়াছি, কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিলাইদহের কুটীতে লালন ফকির একবার গান করিয়া সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া অপরাহ্ন তিনটা পর্য্যন্ত গান চলিয়াছিল; ইহার মধ্যে কেহ স্থানত্যাগ করিতে পারেন নাই। সেই লালন ফকির কাঙ্গালের কুটীরে, আমরা যে দিনের কথা বলিতেছি, সেই দিন আসিয়াছিলেন এবং কয়েকটী গান করিয়াছিলেন। সব কয়টী গান আমার মনে নাই; একটী গান মনে আছে। যথা—

"আমি একদিনও না দেখিলাম তারে ;
আমার ঘরের কাছে আরসী-নগর,
তাতে এক পড়সী বসত করে।
গ্রাম বেড়ে অগাধ পাণি
তার, নাই কিনারা নাই তরণী পারের ;
আমি, মনে করি দেখ্‌ব তারি,
আমি, কেমনে সেথা যাই রে।
বল্‌ব কি পড়সীর কথা
তার, হস্ত পদ স্কন্ধ কিছুই নাই রে ;
সে যে ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপর
আবার ক্ষণেক থাকে নীরে।
সেই পড়সী যদি আমার হ'ত,
তবে যমযাতনা সকল যেত দূরে ;
আবার, সে আর লালন এক স্থানেই রয় ,
তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে।"

প্রাতঃকালে যখন গান হয়, তখন আমরাও সেখানে উপস্থিত ছিলাম, গানও শুনিয়াছিলাম ; কিন্তু আমরা যে সে গানের মর্ম্ম ধরিতে পারিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। দ্বিপ্রহরের সেই রৌদ্রে শ্রীমান অক্ষয়ের মনে হয় ত হঠাৎ লালন ফকিরের গানের কথা উদিত হইয়াছিল ; তাই সে বলিয়া বসিল "একটা বাউলের দল করিলে হয় না ?" সকলেই তখন বলিয়া উঠিলেন "বেশ, বেশ।"

"বেশ, বেশ" বলাটা খুব সহজ ; কিন্তু গান কোথায় ? বাউলের গান তখন তেমন প্রচলিত হয় নাই ; ক্বচিৎ কখনও দুই একজন ফকির বা দরবেশের মুখে এক আধটা দেহতত্ত্বের গান আমরা শুনিয়াছি। সে সকল

গান কাহারও মনে ছিল না। পণ্ডিত প্রসন্নকুমার বলিলেন "নূতন করিয়া গান প্রস্তুত করিতে হইবে।" শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার না পারেন এমন কার্য্যই নাই। তখনও তিনি যেমন ছিলেন এখনও তাই; বয়সের পরিণতিতে সে ভাবটা এখনও যায় নাই। তিনি যাহা ধরেন তাহাই করিতে পারেন। অক্ষয়কুমার বলিলেন "তার জন্য ভয় কি? ধর্ ত জলদা, কাগজ; বাউলের গানই লেখা যাক।" আমি তখন কাগজ কলম লইয়া বসিলাম। গ্রামবার্ত্তার কাপি লিখিবার জন্য যে কাগজ গোছাইয়া বসিয়াছিলাম, তাহারই শ্রাদ্ধ করিতে বসিলাম। অক্ষয়কুমার বলিলেন—

"ভাব মন দিবানিশি, অবিনাশি,
সত্য-পথের সেই ভাবনা।
যে পথে চোর ডাকাতে, কোন মতে,
ছোঁবে না রে সোনা দানা;
সেই পথে মনোসাধে চল্ রে পাগল,
ছাড় ছাড় রে ছলনা।
সংসারের বাঁকা পথে দিনে রেতে,
চোর ডাকাতে দেয় যাতনা;
আবার রে ছয়টী চোরে ঘুরে ফিরে,
লয় রে কেড়ে সব সব সাধনা।"

এই পর্য্যন্ত লেখা হইলেই অক্ষয় বলিলেন "এত দূর ত হোলো— তার পর?" তার পর—আবার কি? গানটা গাওয়া হবে। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন "কথাটা বুঝিলে না। বাউলের গানের নিয়ম হচ্চে এই যে, গানের শেষ একটা ভণিতা দিতে হয়। কেমন?" অক্ষয় বলিলেন "সেই কথাই ত ভাব্‌ছি।" তখন এক এক জন এক একটা নাম বলিতে লাগিলেন। কিন্তু কোনটাই 'ভোটে' টিকিল না। আমি

বলিলাম "অত গোলে কাজ কি। গানটা নিয়ে কাঙ্গালের কাছে যাই, তিনি শেষ অন্তরা এবং ভণিতা ঠিক কোরে দেবেন।" অক্ষয় বলিলেন "তা হবে না; তাঁকে একেবারে Surprise ( অবাক্ ) কোর্‌তে হবে। রও না, আমিই একটা নূতন নাম ঠিক কোরছি।" এই বলিয়া একটু মাথা চুল্‌কাইয়া বলিলেন "লেখ্ জলদা!" আমি কলম ধরিলাম, অক্ষয় শেষ অন্তরা বলিলেন—

"ফিকিরচাঁদ ফকির কয় তাই, কি কর ভাই,
মিছামিছি পর ভাবনা;
চল যাই সত্য পথে, কোন মতে,
এ যাতনা আর রবে না।"

ব্যস্। গানের ভণিতা হইয়া গেল। সকলে একবাক্যে স্বীকার করিলেন "ফিকিরচাঁদ" নামটা ঠিকই হইয়াছে। আমাদের ত ধর্ম্মভাব ছিল না, কোনও "ফিকিরে" সময় কাটানই আমাদের উদ্দেশ্য। "ফিকিরচাঁদ" নামের ইহাই ইতিহাস!

গানটা হইয়া গেল, তখন আমাদের মধ্যে পাকা ওস্তাদ প্রফুল্লচন্দ্র গানের সুর দিলেন। সুরটা নূতন কি পুরাতন, তাহা আমি বলিতে পারিব না। কিন্তু পুরাতন হইলেও, ঐ সুর বড়ই বাজিয়া উঠিল; পরে সমস্ত বাঙ্গালা দেশ ঐ সুরে মাতিয়া উঠিয়াছিল।

সেই দ্বিপ্রহরে আমাদের মজ্‌লিসে যখন গানের রিহার্সেল দেওয়া শেষ হইল, তখন স্থির হইল গানটা একবার কাঙ্গালকে শুনাইতে হইবে। আমরা সকলে তখন দল বাঁধিয়া বাড়ীর মধ্যে কাঙ্গালের জীর্ণ খড়ের ঘরে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি তখন কি যেন লিখিতেছিলেন। এত বড় একটা রেজিমেন্টকে অসময়ে দেখিয়া তিনি বলিলেন "কি, তোদের আবার তর্ক বেধেছে না কি। তোদের জ্বালায় দেখ্‌ছি একটু স্থির হ'য়ে

কাজ করবারও যো নেই। কি ব্যাপার বল্ ত?" তখন শ্রীমান্ অক্ষয় আমাদের মুখপাত্র স্বরূপ (কারণ তিনি তখন বি, এল পড়েন—লায়েক হইয়াছেন) বলিলেন "আমরা একটা বাউলের দল কোরবো। তার জন্য একটা গান লিখিছি।"

গানের কথা শুনিলে কাঙ্গাল সাত রাজার ধন হাতে পাইতেন। তিনি অমনি পরম উৎসাহে বলিলেন "গান লিখিচিস্? সুর বসানো হোয়েছে?" প্রফুল্ল বলিলেন "সব হোয়েছে; এখন শুধু আপনার শোনা বাকি।" তখন তিনি বলিলেন "বেশ, বেশ; সকলে মিলে গা দেখি।"

আমরা সকলে গান ধরিলাম। গানের মুখটুকু তিনি বসিয়া বসিয়াই শুনিলেন; তাহার পর যখন অন্তরা ধরা হইল তখন আর তিনি বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া পড়িলেন। আমরা ত দাঁড়াইয়াই। তাহার পর গান আর নৃত্য—নৃত্য আর গান! সে এক অপার্থিব দৃশ্য!

শেষে গান থামিয়া গেলে কাঙ্গাল বলিলেন "দেখ্, এই গানে দেশ ভেসে যাবে। তা' একটা গান নিয়ে ত আর বাহির হওয়া যায় না। আমিও একটা গান দিই। অক্ষয়, কাগজ কলম ধর্ ত।"

তখন অক্ষয় কাগজ কলম ধরিলেন। কাঙ্গাল প্রথমে একটু গুণ গুণ করিয়া সুর ভাঁজিলেন; তাহার পর গাইতে লাগিলেন, অক্ষয় লিখিয়া লইতে লাগিল। তিনি গাইলেন—

"আমি কোরব এ রাখালী কতকাল।
পালের ছটা গরু ছুটে,
কোরছে আমায় হালবেহাল।
আমি, গাদা কোরে নাদা পূরে রে,
কত যত্ন ক'রে খোল বিচালী খেতে দিই ঘরে;

তারা ছটা যে শুখেকো গরু রে ;
তারা, নরক খায় রে হামেহাল।
কাঙ্গাল কাঁদে প্রভুর সাক্ষাতে,
তোমার রাখালী নেও আর পারিনে গরু চরাতে ;
আমি আগে তোমার যা ছিলাম হে,
আমায় তাই কর দীনদয়াল।"

এইটী দ্বিতীয় গান। এই দুইটী গান লইয়া প্রথম প্রেসের ভূতেরা সন্ধ্যার সময় গ্রামে বাহির হইলেন। সেই নিদাঘের সন্ধ্যার সময়ে যখন আলখেল্লা পরিধান করিয়া, মুখে কৃত্রিম দাড়ী লাগাইয়া, নগ্নপদে গ্রাম-বার্ত্তার প্রেস হইতে ভূতের দল বাহির হইল এবং খঞ্জনী, একতারা ও গোপীযন্ত্র বাজাইয়া গান ধরিল

"ভাব মন দিবানিশি—"

তখন সেই গান শুনিবার জন্য সমস্ত গ্রাম ভাঙ্গিয়া পড়িল। সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল, বৃদ্ধেরা অশ্রুবর্ষণ করিলেন। তাহার পরদিন হইতে পথে ঘাটে আর কোন কথা নাই, শুধু

"আমি কোরব এ রাখালী কত কাল।"

দুইটী গান লইয়া বাউলের দল প্রথমে গ্রামে বাহির হইল ; কিন্তু দুইটী গানে লোকের পিপাসা মিটিল না ; দুই তিন দিন যাইতে না যাইতেই কুমারখালী গ্রামের এবং নিকটবর্ত্তী কুড়ি পঁচিশ খানি গ্রামের আবালবৃদ্ধ গান দুইটী কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিল। আমরা যখন যেখানে যাইতাম, শুধু শুনিতাম কেহ গাহিতেছে—

"ভাব মন দিবানিশি—"

অথবা আর কেহ গাহিতেছে—

"আমি কোরব এ রাখালী কত কাল।"

তখন শ্রীমান্ অক্ষয়কে আরও গান বাঁধিবার জন্য বলা হইল; অক্ষয় অস্বীকার করিলেন। তিনি বলিলেন "আমি আর গান বাঁধিব না; দেখিতেছ না এ গানে শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে। এখন কাঙ্গাল ব্যতীত এ স্রোতের মুখে আর কেহ দাঁড়াইতে পারিবে না! এখন ইহার পশ্চাতে সাধনার বল থাকা চাই, নতুবা চলিবে না।"

অক্ষয় যখন জবাব দিলেন, তখন আমাদের ভূতের দলের সর্দ্দার প্রসিদ্ধ গায়ক ( এক্ষণে পরলোকগত ) প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় অগ্রসর হইলেন; তিনি বলিলেন "আমি গান বাঁধিব।" যে বলা সেই কাজ। প্রফুল্ল গান গাহিতে পারিত; প্রেসের প্রিণ্টারের প্রাণে যে ভাবের সঞ্চার হইয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। প্রফুল্ল পনর মিনিটের মধ্যে একটা গান বাঁধিয়া ফেলিলেন। আমরা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম; বুঝিলাম তাঁহার কৃপা হইলে অসম্ভবও সম্ভব হয়। প্রফুল্লের গানটী আমি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। গানটী এই—

"ভাবী দিন কি ভয়ঙ্কর, ভেবে একবার,
দেখ্ রে আমার মন পামরা।

১। আত্মীয় ডাক্তার বদ্দি, নিরবধি, ঔষধ আদি দেবে তারা;
যখন তোর হাত ধরিতে, তর্জ্জনীতে,
না করিবে নড়া চড়া।

২। যখন তোর সবশ অঙ্গ অবশ হ'য়ে,
প'ড়ে রবে ধ'রে ধরা;
যখন তোর আত্মলোকে, ডেকে ডুকে
না পাইবে কথার সাড়া।

৩। যে গলার মধুর স্বরে, জগতেরে মাতাস্ ওরে ঘাটেপড়া ;
তখন তোর সেই স্বরেতে থেকে থেকে
রব করিবে ঘড়াৎঘড়া।

৪। তাই বলি, যাই দেখি চল্ সত্যপথে নিত্যনগরেতে মোরা ;
শুনেছি সেই ধামেতে এইরূপেতে
মরে না রে মানুষ যারা।”

প্রফুল্লচন্দ্র এই গানটী রচনা করিলেন বটে, কিন্তু তিনি ইহাতে কোন ভণিতা দিলেন না। তিনি বলিলেন, “আমি আমার এ প্রথম গানে ভণিতা দিব না। এ গান আমার রচনা নহে ; আমার সাধ্য কি যে, আমি এ গান রচনা করি। যিনি আমার মুখ দিয়ে, আমার মত মহাপাপী ও দুশ্চরিত্রের মুখ দিয়ে এ গান বাহির ক’রে দিয়েছেন, তাঁর যদি ইচ্ছা হয়, তবে তিনি ভণিতা দিবেন।” তাই এ গানটীর কোন ভণিতা নাই ; কিন্তু তৃতীয় দিনে যখন এই গানটী লইয়া ফকিরের দল গ্রামে বাহির হইলেন, তখন এই গান শুনিয়া লোকে একেবারে অধীর হইয়া গেল। যে একবার শুনিল, সে দ্বিতীয়বার শুনিবার জন্য দলের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতে লাগিল। কাঙ্গালের কুটীর হইতে গানের দল বাহির হইয়া যখন বাজারে পৌঁছিল তখন লোকারণ্য ; দূর গ্রাম হইতে লোকেরা এই দলের গান শুনিবার জন্য বেলা দ্বিপ্রহর হইতে আসিয়া অপেক্ষা করিয়া আছে। বাজারের উপর যখন এই গানটীর আগাগোড়া গীত হইল, তখন কাহারও চক্ষু শুষ্ক ছিল না ; সকলেরই প্রাণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল। আমি অনেক দিন এমন জন-সমারোহ দেখি নাই। আর বলিতে কি, এমন প্রাণস্পর্শী গানও আমি কখনও শুনি নাই। এখনও আমার নয়নসম্মুখে সেই দৃশ্য বর্ত্তমান দেখিতেছি। সে আজকালকার কথা নহে। ফিকিরচাঁদ ফকিরের দল বাঙ্গালা ১২৮৭ সালে প্রথম গঠিত

হয়। আজ ৩৩ বৎসর পরেও আমি সে দিনের দৃশ্য অবিকল দেখিতে পাইতেছি। দেখিতেছি একদল ফকির; সকলেরই গৈরিক আলখেল্লা পরা; কাহারও মুখে কৃত্রিম দাড়ী, কাহারও মাথায় কৃত্রিম বাব্‌ড়ী চুল, সকলেই নগ্নপদ। সম্মুখভাগে প্রফুল্লচন্দ্র, তাহার বামপার্শ্বে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ বানবারীলাল, দক্ষিণ পার্শ্বে তাহার খুল্লতাতপুত্র শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ। প্রফুল্লচন্দ্র কৃত্রিম দাড়ি বা চুল পরিধান করিত না! সে গৌরকায়, সুপুরুষ ছিল; তাহার মুখে দাড়ি ছিল। আমি এখনও দেখিতে পাইতেছি, তিন ভাইয়ের হস্তে তিনখানি খঞ্জনী। সেই তিন-খানি খঞ্জনীতে এক সময়ে ঘা পড়িতেছে, আর তিন ভাই প্রেমে মত্ত হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া নাচিতেছে, আর গাহিতেছে—

"ভাবী দিন কি ভয়ঙ্কর—"

বলিতে কি, সে সময়ে আমাদের অঞ্চলের লোকে যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কে জানিত যে, আমাদের অবসর সময়ের খেয়াল হইতে যে সামান্য গানটী বাহির হইয়াছিল, তাহার তেজ এত অধিক! কে জানিত যে, এই কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের সঙ্গীতে সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গ, মধ্যবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ এবং আসাম প্রদেশ ভাসিয়া যাইবে! কে জানিত যে, সামান্য বীজ হইতে এমন প্রকাণ্ড বৃক্ষ জন্মিবে! প্রিয়তম অক্ষয়কুমার সত্যসত্যই বলিয়াছিলেন যে "এমন যে হইবে তাহা ভাবি নাই! এমন করিয়া যে দেশের জনসাধারণের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করা যায়, তাহা আমি জানিতাম না।"

প্রফুল্লচন্দ্রের গান বেশ হইয়াছে দেখিয়া সকলেরই মনে সাহসের সঞ্চার হইল। তখন প্রফুল্লচন্দ্র পরম উৎসাহে আর একটী গান রচনা করিল এবং ফিকিরচাঁদ ভণিতা ব্যবহার করিল। সে গানটীও আমি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। গানটি এই—

"দেখ্ দেখি ভেবে ভবে, কেবা রবে,
যে দিনে সে তলব দিবে।

১। কোথা তোর রবে বাড়ী, টাকা কড়ি, জুড়ী গাড়ী কে হাঁকাবে ;
বল্ দেখি চেন ঝুলান ঘড়ী তোমার,
সেই দিনেতে কে পরিবে।

২। কোথা তোর রবে মালা, কৌপীন ঝোলা,
যে দিনে তোমায় বাঁধিবে ;
তার কাছে ছাপাবার যো নাই রে যাদু,
ছাপা দিয়ে যে ছাপাবে।

৩। ফিকিরচাঁদ ফকিরে কয়, তা হবার নয়,
ঘুস দিয়ে কাজ হাসিল হবে ;
বিপদে তর্‌বি যদি, নিরবধি,
সেবিগে চল্ সত্যদেবে ( ও ভোলা মন )।"

এখানে একটি কথা বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে। উপরিলিখিত গানটিতে তথাকথিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের উপর একটু ইঙ্গিত আছে বলিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন ; কিন্তু যিনি এই গানের রচয়িতা, তিনি সত্য সত্যই কাহারও উপর কটাক্ষ করেন নাই। আমাদের গ্রামটী বৈষ্ণব-প্রধান গ্রাম। আমাদের গ্রামে ব্রাহ্মণ কায়স্থের সংখ্যা বেশী নহে ; তিলি এবং তন্তুবায়গণের সংখ্যাই আমাদের গ্রামে অধিক। কাঙ্গাল হরিনাথই তিলিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদের গ্রামে তিলিজাতিই বিশেষ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ; তাঁহারা সকলেই বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী। তাঁতি, কামার, কুমার ও অন্যান্য সকলেই বৈষ্ণব। সুতরাং আমাদের গ্রামে বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল এবং এখনও আছে। এ অবস্থায় ধর্ম্মের সম্বন্ধে কথা বলিতে হইলে স্বতঃই কদাচারী বৈষ্ণবগণের কথাই মনে উঠিয়া থাকে

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

সুতরাং ইহা ব্যক্তি বা সম্প্রদায়-বিশেষের উপর আক্রমণ বলিয়া আমরা স্বীকার করি নাই এবং এখনও করি না; প্রফুল্লচন্দ্রও তখন এ কথার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

এইরূপ একটু প্রতিবাদ হইয়াছে শুনিয়া কাঙ্গাল হরিনাথ দুইটী গান দিলেন। এ দুইটি গান বড়ই সুন্দর। আমি তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না। প্রথম গানটি এই—

"বল কে চিনিবে আর, মন রে তোমার,
মনের মাঝে রোগের হাঁড়ি।
চিনিবে কার সাধ্য, ডাক্তার বৈদ্য
হদ্দ হ'ল টিপে নাড়ী।
১। তুমি যে সাধুর গান গাও, জগৎ মাতাও,
উপদেশ দেও নেড়ে দাড়ি;
তোমার যে, আপন বেলায় মহাপ্রসাদ,
পরের বেলায় ভাতের কাঁড়ি।
২। তুমি, এই রোগের জ্বালায় জ্বলছ সদাই,
দেখে লোকের টাকাকড়ি;
তোমার এ জ্বর-বিকারে বৈদ্য ঘোরে,
ভেবে মরে কি দেবে বড়ি।
৩। কাঙ্গাল কয় হও রে দৃঢ়, ছাড় ছাড়
কুপথ্য মিথ্যা ছল চাতুরী;
এ রোগের জ্বালা যাবে, প্রাণ জুড়াবে,
খাও রে হরিনামের বড়ি।"

দ্বিতীয় গানটী এই—

"মজে তুই হরিনামে, মাতি প্রেমে,
কেন না মন সং সাজিলি।

১। মন রে, সংসারে এসে, হেসে হেসে,
আগে কেশে কালী দিলি ;
ওরে মন, বয়সদোষে, রসে রসে,
অবশেষে চুন মাখিলি।

২। হরিনামে সাজ্‌লে রে সং, ফিরত না ঢং,
থাকৃত এক রং চিরকালই ;
এখন তোর, কতক রাঙ্গা, কতক পাঙ্গা,
ঠিক যেন মাছরাঙ্গা হ'লি।

৩। যাবি তুই লেংঠা হয়ে, লজ্জা খেয়ে,
লেংঠা হ'য়ে যেমন এলি ;
ওরে, তোর কৌপীন কোঁচা, জামা মোজা,
ঘোলে গোঁজা হয় সকলই।

৪। কাঙ্গাল কয়, প্রেমভরে, সং সাজ রে,
গান কর রে বাহু তুলি ;
যাদের নাই হরি-ভজন, সত্য -কথন,
তারাই রে সং হয় কেবলই।"

এই ফিকিরচাঁদের গান সম্বন্ধে কাঙ্গাল হরিনাথ তাঁহার তৎসময়ের দিনলিপিতে যে কয়েকটী কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা আমি এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। কাঙ্গাল লিখিতেছেন—"শ্রীমান অক্ষয় ও শ্রীমান প্রফুল্লের গানগুলির মধ্যে আমি যে মাধুর্য্য পাইলাম, তাহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম, এই ভাবে সত্য, জ্ঞান ও প্রেম-সাধনতত্ত্ব প্রচার করিলে,

পৃথিবীর কিঞ্চিৎ সেবা হইতে পারে। অতএব কতিপয় গান রচনায় দ্বারা তাহার স্রোত সত্য, জ্ঞান ও প্রেম-সাধনের উপায় স্বরূপ পরমার্থ-পথে ফিরাইয়া আনিলাম এবং ফিকিরচাঁদের আগে 'কাঙ্গাল' নাম দিয়া দলের নাম 'কাঙ্গাল-ফিকিরচাঁদ' রাখিয়া তদনুসারেই গীতাবলীর নাম করিলাম। কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ-ফকিরের দলস্থ গায়কেরা বাউল সম্প্রদায়ের ন্যায় বেশ ও পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া গান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। হৃদয় যতই পবিত্র হইতে লাগিল, ততই সত্য, জ্ঞান, ও প্রেমময় গীতি-সকল উদ্ভাসিত হইয়া হৃদয়ক্ষেত্র সত্য, জ্ঞান, ও প্রেমানন্দে পূর্ণ করিতে লাগিল। দলস্থ যাঁহারা যতদূর পবিত্রতা রক্ষা করিতে লাগিলেন, তাঁহারা নিজ নিজ কৃত বিষয়ে ততদূর এক আশ্চর্য্য শক্তি লাভ করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই কাঙ্গাল-ফিকিরচাঁদের গান নিম্নশ্রেণী হইতে উচ্চ শ্রেণীর লোকের আনন্দকর হইয়া উঠিল। মাঠের চাষা, ঘাটের নেয়ে, পথের মুটে, বাজারের দোকানদার এবং তাহার উপর শ্রেণীর সকলেই প্রার্থনা সহকারে ডাকিয়া কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের গান শুনিতে লাগিলেন। কিন্তু নানা কারণে দেশস্থ কয়েকজন প্রধান ব্যক্তি বিপক্ষ হইয়া উঠিলেন এবং নানা প্রকারে হৃদয়ে বেদনা প্রদান করিতে লাগিলেন। আমি একাকী সকল আঘাত সহ্য করিতে লাগিলাম। তিলার্দ্ধ মাত্রও অবসর নাই। সংসারধর্ম্ম ও সংসারধর্ম্মের অতীত পরমার্থ পর্য্যন্ত, যিনি কেন যে কার্য্য না করুন, জগৎ তাহার প্রতিবাদ করিবেই করিবে। প্রতিবাদ আছে বলিয়া এ জগতে এখনও কিছু দৃঢ়তা, পবিত্রতা রহিয়াছে ; অন্যথা ইহাও থাকিত না। কৃত কার্য্যে যতই প্রতিবাদ হইতে থাকে, কার্য্যে ততই স্বতঃ দৃঢ়তা জন্মে। যিনি ফিকির করিয়া, হাপরে স্বর্ণ দগ্ধ করিয়া খাঁটি করিবার জন্য আমাকে এইরূপ দগ্ধ করিতেছেন, বিরলে কেবল তাঁহার উদ্দেশে ক্রন্দন করিয়া চক্ষের জলে বক্ষদেশ ভাসাইতে লাগিলাম।

"আমি যে সময়ে এই অসহ্য যন্ত্রণায় নিষ্পেষিত হইতেছি, সেই সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ভক্ত-চূড়ামণি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া কুমারখালীতে আসিয়া কাঙ্গালের কুটীরেই সপরিবারে অবস্থান করিলেন। আমি তাঁহাকে না বলিলেও তিনি নিজ প্রভাবেই আমার যন্ত্রণা বুঝিতে পারিয়া সান্ত্বনা পূর্ব্বক এই ভাবে উপদেশ প্রদান করিলেন যে, সর্ব্বপ্রকার উত্তাপ সহ্য করিয়া ক্ষেত্র কর্ষণ ও পরিষ্কার কর, অমৃতফল ফলিবে।

"এই সময়ে একদিন আমার জ্বর বোধ হওয়ায় কুশাসনে শয়ন করিয়া আছি। ইহা ত শারীরিক কোন প্রকার জ্বর নহে; ইহা মর্ম্মাঘাত ও চিন্তা-জ্বর, অনলদগ্ধের ন্যায় হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। সুতরাং নিদ্রা নাই। কিন্তু চক্ষু মুদ্রিত এবং নিদ্রার ন্যায় অভিভূত। স্কন্ধদেশ হইতে চরণ পর্য্যন্ত অব্যক্ত মহাদেবী জগন্মাতার একখানি অভূতপূর্ব্ব মুখ আমার মুখের উপরে প্রকাশিত হইল। শরীর চকিত হইয়া উঠিল। এ কি ব্যাপার! ভাবিতে ভাবিতে চক্ষুর জলে দগ্ধ হৃদয় শীতল হইতে লাগিল। তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে। যিনি আমার মুখের উপর মুখ প্রকাশ করিয়া সান্ত্বনা করিয়াছিলেন, এ সকল তাঁহারই খেলা। তিনি অব্যক্ত হইয়াও, যে তাঁহার হয়, তাহার নিকট ব্যক্ত হইয়া তাহাকে সান্ত্বনা করেন। তখন আমার এই বিশ্বাস এত বলবতী হইয়া উঠিল যে, আমি যে রূপ দেখিয়াছিলাম সেই চিন্ময় রূপ দেখিবার নিমিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হইলাম; এবং এক্ষণে সংসারের সকল প্রকার জ্বালাযন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত প্রতিদিন বিরলে বসিয়া তাঁহার নিকটেই কাঁদিতে আরম্ভ করিলাম। আমি কি ছিলাম, কে আমাকে এরূপ করিল? সংশোধন করিয়া আমার হৃদয়-ফলক এমন নির্ম্মল করিল যে, তাহা অব্যক্তের স্বরূপশক্তি প্রকাশের মত করিয়া তুলিল।"

সেই দিনের অবস্থা স্মরণ করিয়া কাঙ্গাল যে গানটী লিখিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।
গানটী এই—

"অরূপের রূপের ফাঁদে, প'ড়ে কাঁদে
প্রাণ যে আমার দিবানিশি।
১। কাঁদ্‌লে নির্জ্জনে ব'সে, আপনি এসে
দেখা দেয় সে রূপরাশি;
সে যে কি অতুল্য রূপ, নয় অনুরূপ
শত শত সূর্য্য শশী।
২। যদি রে চাই আকাশে, মেঘের পাশে
সে রূপ আবার বেড়ায় ভাসি;
আবার রে তারায় তারায় ঘুরে বেড়ায়,
ঝলক্ লাগে হৃদে আসি।
৩। হৃদয় প্রাণ ভ'রে দেখি, বেঁধে রাখি,
চিরদিন সেই রূপশশী;
ওরে, তায় থেকে থেকে ফেলে ঢেকে
কু-বাসনা মেঘরাশি।
৪। কাঙ্গাল কয়, যে জন মোরে দয়া ক'রে,
দেখা দেয় রে ভালবাসি;
আমি যে সংসার-মায়ায় ভুলিয়ে, তাঁয়
প্রাণ ভ'রে কৈ ভালবাসি।"

কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের গান আর আমাদের ক্ষুদ্র কুমারখালী গ্রামে আবদ্ধ থাকিতে পারিল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় এই গান শুনিবার জন্য চারি পাঁচ ক্রোশ দূর হইতে অনেক লোক

আসিতে আরম্ভ করিল। এ দিকে রেলপথেও বহুদূর হইতে অনেকে আসিতে লাগিল। সকলেরই অনুরোধ, তাহাদের গ্রামে একবার ফিকির-চাঁদের দলের পদার্পণ করিতে হইবে।

শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার কয়েকদিন বাড়ীতে থাকিয়াই, রাজসাহী চলিয়া গেলেন। আমি তখন গোয়ালন্দে স্কুল-মাষ্টারী করি। আমিও কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেলাম। কিন্তু ফিকিরচাঁদের এমন আকর্ষণ যে, আমি প্রতি শনিবারের রাত্রিতে বাড়ী যাইতাম এবং যে একদিন থাকিতাম, সমস্ত কার্য্য ফেলিয়া নূতন নূতন গান শুনিতাম। আমরা তখন বাহিরে পড়িয়া গেলাম। ফিকিরচাঁদের গানের দলের ব্যবস্থার ভার কাঙ্গালের উপরই পড়িল।

চারিদিক্ হইতে যখন নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল, তখন কাঙ্গাল এই নিয়ম করিয়া দিলেন যে, ফিকিরচাঁদের দল গ্রামেই হউক বা বিদেশেই হউক, যেখানে যাইবেন, সেখানে কাহারও গৃহে অতিথি হইতে পারিবেন না, সামান্য একছিলিম তামাকও বাড়ী হইতে লইয়া যাইতে হইবে। তবে দলের লোকদিগের গৃহে গেলে এ নিয়ম খাটিবে না। পাছে ইহা একটা ব্যবসায়ে পরিণত হয়, এই আশঙ্কা করিয়াই কাঙ্গাল এই নিয়ম করিয়া দিলেন।

এই সময়ে একদিন পরলোকগত মীর মশারফ হোসেন মহাশয় কুমার-খালীতে আসিলেন। তিনি কাঙ্গালের সাহিত্য-শিষ্য ছিলেন। মীর সাহেবের বাড়ী কুমারখালীর অনতিদূরে গৌরী নদীর তটে লাহিনীপাড়া গ্রামে। জাতিতে মুসলমান হইলেও তিনি বাঙ্গালা ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া ভক্তি করিতেন। কাঙ্গাল হরিনাথ মীর মশারফ হোসেনকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন এবং বাঙ্গলা লেখা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করি-তেন। এই উৎসাহের ফলেই মীর সাহেব বাঙ্গালা-সাহিত্যের একজন

লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক হইয়াছিলেন। তাঁহার 'বিষাদ-সিন্ধু' তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। মীর মশারফ কাঙ্গালের প্রকাশিত "গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা" পত্রিকার লেখক ছিলেন। আমরা যখন স্কুলে পড়িতাম তখন প্রতি সপ্তাহে মীর সাহেবের লেখা পড়িবার জন্য যে কত আগ্রহ হইত তাহা বলিতে পারি না। তিনি প্রবন্ধের নিম্নে নিজের নাম দিতেন না,—লিখিতেন "গৌরীতটবাসী মশা"। এই 'মশার' লিখিত গদ্য-পদ্য সন্দর্ভ পাঠ করিয়া আমরা যে কত উপকৃত হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার 'গৌরী সেতু', তাঁহার "উদাসীন ফকিরের মনের কথা", তাঁহার "গাজি মিঞার বস্তানি" আর তাঁহার অমূল্য রত্ন "বিষাদ-সিন্ধু" যে আমরা কতবার পড়িয়াছি তাহার সংখ্যা করা যায় না। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য কত পরিশ্রম করিয়াছেন। আমাকে বলিয়াছিলেন, "তোমাকে নীলবিদ্রোহ সম্বন্ধে অনেক 'নোট' দিয়া যাইব, তুমি একখানি ইতিহাস লিখিও। আমি এ বয়সে আর পারিলাম না।" আলস্য বশতঃ সে 'নোট'ও লওয়া হইল না। তিনিও আমা-দিগকে ফাঁকি দিয়া দুই বৎসর হইল সাধনোচিত ধামে চলিয়া গিয়াছেন। এতদিনের মধ্যে এমন একজন একনিষ্ঠ সাহিত্য-সেবকের নাম কেহই করেন নাই। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে চুঁচুড়ার সাহিত্য-সম্মিলনের অধি-বেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়-চন্দ্র সরকার মহাশয় মীর মশারফ হোসেনের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার গুণবর্ণনা করিয়াছিলেন।

যাক্ সে কথা। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে একদিন মীর মশারফ হোসেন কুমারখালীতে কাঙ্গালের কুটীরে উপস্থিত হইলেন এবং ফিকিরচাঁদের দলকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কাঙ্গাল সম্মত হইলেন। তিনি বলিলেন, "দলের

নিয়মানুসারে দলের লোকেরা তোমার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিবেন না। তোমার বাড়ীতে গান শেষ করিয়া দলের লোকেরা সেই রাত্রিতেই বাড়ী ফিরিয়া আসিবেন; তোমার বাড়ীতে তাঁহারা এক ছিলিম তামাকও খাইবেন না।" মশারফ বলিলেন "সে কি রকম কথা! তা কি হয়?" কাঙ্গাল বলিলেন "তবে তুমি যদি এই দলভুক্ত হও, তবে তাঁহারা তোমার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারেন।" মশারফ হাসিয়া বলিলেন "আমি ত গান করিতে জানি না।" কাঙ্গাল উত্তর করিলেন "গান করিতে জান না বটে, কিন্তু গান ত লিখিতে জান।" মীর মশারফ বলিলেন "তাহা হইলে আমি দলভুক্ত হইলাম। এখনই গান লিখিয়া দিয়া যাইতেছি।" এই বলিয়া তিনি তখনই গান লিখিতে বসিলেন। আমরা সেই গানটী নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম; মীর সাহেব এই দলের জন্য আর কোন গান পরে দেন নাই। গানটী এই—

"রবে না দিন চিরদিন, সুদিন কুদিন,
একদিন দিনের সন্ধ্যা হবে।
১। এই যে আমার আমার, সব ফক্কিকার,
কেবল তোমার নামটী রবে;
হবে সব লীলা সাঙ্গ, সোণার অঙ্গ
ধূলায় গড়াগড়ি যাবে।
২। সংসারের মিছে বাজী, ভোজের বাজি,
সব কারসাজি ফুরাইবে;
তখন রে এক পলকে, তিন ঝলকে,
সকল আশা ঘুচে যাবে।
৩। তোমার এই আত্ম স্বজন, ভাই পরিজন,
হায় হায় ক'রে কাঁদ্‌বে সবে;

তারা ত পেয়ে ব্যথা, ভাঙ্গবে মাথা,
তুমি কথা না কহিবে।
৪। তোমার সব টাকাকড়ি, ঘর বাড়ী,
ঘড়ি গাড়ী পড়ে রবে ;
আবার রে পা থাকিতে, হাত রহিতে,
পরের কাঁধে যেতে হবে।
৫। আগে যে ক'রে হেলা, গেল বেলা,
সন্ধ্যাবেলা আর কি হবে ;
জগতের কারণ যিনি, দয়ার খণি,
তিনিই 'মশার' ভরসা ভবে।"

তাহার পরই একদিন ফিকিরচাঁদের দল মীর সাহেবের লাহিনীপাড়ার বাড়ীতে যাইয়া গান করিয়া আসিলেন। আমাদের গ্রামের নিকটবর্ত্তী এমন গ্রাম অতি কমই ছিল, যেথানে ফিকিরচাঁদের দলকে গান করিবার জন্য যাইতে হয় নাই।

ইহার পর দূরদেশ হইতে নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। রাজসাহী, রঙ্গপুর, নাটোর, দীঘাপতিয়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর গোয়ালন্দ প্রভৃতি স্থান হইতে লোক আসিতে লাগিল। কাঙ্গাল অস্বীকার করিতে পারিলেন না। উপরিউক্ত সকল স্থানেই দল গিয়াছিল, কাঙ্গালকেও বাধ্য হইয়া যাইতে হইয়াছিল।

এই দল যখন ফরিদপুরে গমন করে, তখন আমাকে ইহাদের সঙ্গী হইতে হইয়াছিল। সে যাত্রার কথা এখনও আমার মনে আছে। আমি তখন গোয়ালন্দে থাকি। কাঙ্গাল আমাকে পত্র লিখিলেন যে, তিনি দল লইয়া ফরিদপুর কৃষিপ্রদর্শনীতে গান করিতে যাইতেছেন, আমাকেও তাঁহাদের সঙ্গী হইতে হইবে। তখন বড়দিনের ছুটী ছিল। আমি

যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। তাঁহারা শেষরাত্রির গাড়ীতে গোয়ালন্দ পৌঁছিলেন। আমি প্রস্তুত হইয়া ষ্টেসনে ছিলাম। একসঙ্গে ষ্টীমারে চড়িয়া ফরিদপুরে গেলাম। আমাদের গ্রামবাসী এক্ষণে পরলোকগত প্রসন্নকুমার সান্যাল মহাশয় ফরিদপুরে ওকালতি করিতেন। তিনি কাঙ্গালের ছাত্র এবং আমাদের মাষ্টার। আমরা তাঁহার বাসায় উঠিলাম। সে দিন আর গান হইল না। তাহার পরদিন মেলা কমিটীর সেক্রেটারী মহাশয় বলিয়া গেলেন যে, সেই দিন অপরাহ্ণকালে মেলার মণ্ডপে ফিকিরচাঁদের গান হইবে।

আমরা ফরিদপুরে যাইয়াই শুনিয়াছিলাম যে, প্রসিদ্ধ পাগ্‌লা কানাই ফরিদপুরে গান করিতে আসিয়াছে। পাগ্‌লা কানাইয়ের নাম কলিকাতা অঞ্চলের লোক না জানিতে পারেন ; কিন্তু এক সময়ে পাগলা কানাইয়ের গানে যশোহর, ফরিদপুর, পাবনা ও নদীয়া জেলার অংশবিশেষ ভাসিয়া গিয়াছিল। পাগলা কানাইয়ের গান শুনিবার জন্য এক এক সময় চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার নিম্নশ্রেণীর হিন্দূ মুসলমান একস্থানে সমবেত হইত। এক-দিনের পথ হাঁটিয়া লোকে পাগলা কানাইয়ের গান শুনিতে আসিত। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন পাগলা কানাই বৃদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু তখনও তাহার গলার এমন আওয়াজ ছিল যে, পঞ্চাশ হাজার লোকের মধ্যে দাঁড়াইয়া গান করিলেও সকলে তাহার গান শুনিতে পাইত। আমরা ফরিদপুরে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম যে, আমাদের যে সময় গান করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার পূর্ব্বে অর্থাৎ মধ্যাহ্ন বারটার সময় পাগলা কানাইয়ের গান আরম্ভ হইবে। কাঙ্গাল বলিলেন "তোরা ত সে গান শুনিস্ নাই, কানাইয়ের গান শুনিলে লোকে পাগল হইয়া যায়।"

আমরা বেলা ১২টার সময় মেলার মাঠে যাইয়া দেখি যে, সে এক

আশ্চর্য্য দৃশ্য! অনুমান ত্রিশ হাজার হিন্দু মুসলমান কানাইয়ের গান শুনিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। একটু পরেই মাথায় লম্বা লম্বা চুল-ওয়ালা দশ বার জন লোক কানাইকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। জনসংঘের মধ্যে হিন্দুগণ "হরিবোল" এবং মুসলমানগণ "আল্লা আল্লা" ধ্বনি করিয়া তাহাদের অভ্যর্থনা করিল। সে যে কি আনন্দ, সে যে কি উন্মাদনা, তাহা আমি ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিব না। যাহারা গান করিতে আসিয়াছে, তাহাদিগের জন্য মাঠের মধ্যে একটী কাষ্ঠের মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল; তাহারই উপর দাঁড়াইয়া গান না করিলে কানাইকে কেহ দেখিতে পাইবে না বুঝিয়াই মেলার কর্ত্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কানাই ও তাহার দলের লোকেরা মঞ্চের উপর আরোহণ করিল; প্রত্যেকের হস্তে একখানি করিয়া খঞ্জনী, আর কোন বাদ্যযন্ত্র নাই।

একটু পরেই তাহারা গান আরম্ভ করিল। এই যে ত্রিশ হাজার লোক, ইহারা মন্ত্রমুগ্ধের মত গান শুনিতে লাগিল। তাহারা যে কয়টী গান গাহিল, সমস্তই অনিত্যতা সম্বন্ধে। আমরা অবাক্ হইয়া এই দশটী লোক ও বৃদ্ধ কানাইয়ের সুরবাজি, সুরের খেলা শুনিতে লাগিলাম। ধন্য আওয়াজ! ধন্য শিক্ষা! আমি সে গানের বর্ণনা করিতে পারিলাম না; যাঁহারা পাগলা কানাইয়ের গান শুনিয়াছেন, তাঁহারাই আমার কথা বুঝিতে পারিবেন।

পাগ্‌লা কানাইয়ের গান চারিটা পর্য্যন্ত চলিবে, তাহার পরই ফিকির-চাঁদের গান আরম্ভ করিতে হইবে। সৌভাগ্যের কথা এই যে, তাহা-দিগকে সেই মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া গান করিতে হইবে না; তাহা হইলে আমি ত যোগ দিতেই পারিতাম না। মেলার জন্য যে মণ্ডপ প্রস্তুত হইয়াছিল, সেই মণ্ডপেই ফিকিরচাঁদের গান হইবে; সহরের সমস্ত

ভদ্রলোক, সাহেব 'বিবি ও মফস্বলের নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণ সেখানেই সমবেত হইবেন।

তিনটা যখন বাজিয়া গেল, তখন আমরা আর পাগলা কানাইয়ের গান শুনিবার জন্য সেখানে থাকিলাম না। মেলার মধ্যেই একটী ঘরে আমাদের দলের সাজসরঞ্জাম রক্ষিত হইয়াছিল। কাঙ্গালের ত আর সাজের প্রয়োজন ছিল না—তাঁহার ফকিরেরই বেশ! আর সকলে ফকির সাজিবার জন্য ঘরের মধ্যে গেল। কাঙ্গাল ঘাসের উপর বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার দৃষ্টি উদাস; তিনি কি যেন ভাবিতেছিলেন। আমি তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট। তিনি একটু পরে বলিলেন "কানাইয়ের গান শুন্‌লি ত। এর পরে কি তোদের গান জম্‌বে, তোরা কি পার্‌বি। আমি তাই ভাব্‌ছি।" এ কথার আর কি উত্তর দিব; আমি নীরবে বসিয়া রহিলাম। একটু পরেই তিনি বলিলেন "তোর কাছে কাগজ পেন্সিল আছে?" আমি বলিলাম "আছে।" তিনি বলিলেন "এই যে জনসমুদ্র দেখ্‌ছিস্‌, ইহাদের মধ্যে আজ মায়ের নাম ছড়াইয়া দিতে হইবে। তুই কাগজ ধর, নূতন গান দিই। সেই গান নিয়ে প্রথমে আসরে যেতে হবে।" এই বলিয়া তিনি গান বলিতে লাগিলেন, আমি লিখিয়া লইলাম। গানটী এই—

"আমার আজ এই নিবেদন, লজ্জা বারণ,
কর মা লজ্জারূপিণী।

১। মা, তোমার যে নাম জপে, হৃদয়-কূপে
নিরজনে যোগী মুনি;
সেই নাম আজ জনসমাজে, ফকির সাজে,
গাইতে এলাম ও জননি!

২। মা, আমার হ'তেছে ভয়, কাঁপে হৃদয়,
হৃদে এস বীণা-পাণি ;
মা, তুমি আপনি বাজাও, আপনি গাও,
আপনার নাম, আমি শুনি।

৩। মা, তুমি মা নাম দিয়ে, জাগাইয়ে,
জাগ্‌লে কুলকুণ্ডলিনী ;
এ হৃদয়-বাঁধ ছুটিয়ে, ঢেউ উঠিয়ে,
ভাবে নাচায় ভাবরূপিণী ;

৪। কাঙ্গালের গেছে সজ্জা, লোকলজ্জা,
তোমার, নামে পাগল দিনরজনী ;
নামে না হয় কলঙ্ক, সেই আতঙ্ক,
দেখিস্‌ অনন্তরূপিণী।"

দেখিতে দেখিতে উপরিলিখিত গান প্রস্তুত হইয়া গেল। কাঙ্গাল তখন বলিলেন "এ গান লাগ্‌বেই। তোদের ভয় নাই।" আমি গান লইয়া ঘরের মধ্যে গেলাম। প্রফুল্ল, নগেন্দ্র, সকলেই গান দেখিল। প্রফুল্ল বলিল "হাঁ, ঠিক হ'য়েচে। আমিও তাই ভাব্‌ছিলাম। দেখ্‌বো, আজ মা হারে কি পুত্র হারে।" প্রফুল্লের কথা শুনিয়া সকলেই প্রফুল্ল হইল, সকলেরই হৃদয়ে বলের সঞ্চার হইল। প্রফুল্ল বলিল "আজ আর অন্য যন্ত্রে হ'বে না। সবাই একখানা করিয়া খঞ্জনী হাতে লও।" কে একজন বলিল "আমাদের ত এত খঞ্জনী নাই।" উকিল প্রসন্ন দাদা সেখানে ছিলেন ; তিনি বলিলেন "তাহার জন্য ভাবনা নাই। কানাইয়ের দলের নিকট হইতে খঞ্জনী আনিয়া দিব!" প্রসন্ন দাদার সে দিন আনন্দ দেখে কে? তিনি শুধু বলিতেছেন "দেখিস্‌ প্রফুল্ল, আজ আমাদের গ্রামের নাম রাখিস্‌, আজ কাঙ্গালের নাম রাখিস্‌।"

কানাইয়ের গান ভাঙ্গিয়া গেল। আমাদিগের আসরে যাইবার জন্য অনুরোধ আসিল। কাঙ্গাল তখনও বাহিরে সেই তৃণাসনে বসিয়া আছেন। আমি তাঁহার নিকট যাইয়া বলিলাম "এখন গাইতে যেতে হবে।" তিনি চকিত হইয়া বলিলেন "বেশ, চল।" আমরা কাঙ্গাল হরিনাথকে দলের সম্মুখে প্রথম সারির মাঝখানে লইয়া সকলে মণ্ডপ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। কাঙ্গাল বলিলেন "এখান হইতেই গান ধর।"

তখন এক সঙ্গে পনরখানি খঞ্জনী বাজিয়া উঠিল, পনর জনের স্বর সপ্তমে চড়াইয়া গান আরম্ভ হইল—

"আমার আজ এই নিবেদন"—

চারিদিক্ হইতে লোক একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমরা তখন সত্য সত্যই কি এক ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া গান ধরিয়াছিলাম। মণ্ডপের দ্বারে পৌঁছিতেই গান জমিয়া গেল, সুরের একটা জমাট বাঁধিয়া গেল।

আমরা ধীরে ধীরে মণ্ডপের মধ্যভাগে উপস্থিত হইলাম। তখন আর আমাদের জ্ঞান ছিল না। আমরা প্রাণ খুলিয়া গান করিতে লাগিলাম। মণ্ডপের মধ্যে প্রায় দুই তিন হাজার লোক। সকলে নিঃশব্দে গান শুনিতে লাগিল। যখন শেষের অন্তরা আমরা ধরিলাম, তখন কাঙ্গাল আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তখন নৃত্য আরম্ভ হইল। তখন আর দল বেদল থাকিল না। মণ্ডপের মধ্যস্থ লোকেরাও আসিয়া গানে যোগ দিলেন; বড় ছোট, ধনী দরিদ্র, ভেদ থাকিল না। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! আমার ত মনে হইতে লাগিল চারিদিক্ হইতে সহস্র কণ্ঠ গাহিতেছে—

"নামে না হয় কলঙ্ক—
মা নামে না হয় কলঙ্ক"—

প্রায় তিন কোয়াটার এই একটী গানই হইল। তাহার পরই ফকিরের দল মণ্ডপ হইতে বাহির হইয়া আসিল। চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া

গেল। কত জন আসিয়া কাঙ্গালের পদধূলি লইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি তাহাতে অসম্মত হইলেন। বড় বড় রাজকর্ম্মচারী আসিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ধন্যবাদ করিলেন এবং বলিয়া গেলেন সে দিন যেন আমাদিগকে আর গান করিবার জন্য আহ্বান করা না হয়। পরের দিনও গান হইয়াছিল। সে দিনও ঐ ব্যাপার। তাহার পরের দিনই আমরা ফরিদপুর ত্যাগ করি।

ফরিদপুর হইতে প্রত্যাগমনের সময় ফিকিরচাঁদের দল এবং কাঙ্গাল হরিনাথ তাঁহার এই অযোগ্য শিষ্যের গোপালন্দের বাসায় দুইদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। আমি তখন গোয়ালন্দে মাষ্টারী করিতাম।

কাঙ্গাল হরিনাথ ফিকিরচাঁদের দল সহ গোয়ালন্দে উপস্থিত হইলে সহরময় একটা সোরগোল পড়িয়া গেল। আমাদের ক্ষুদ্র কুটীরে লোক আর ধরে না। গোয়ালন্দ ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে দলে দলে লোক ফিকিরচাঁদের গান শুনিবার জন্য এবং কাঙ্গালকে দেখিবার জন্য আসিতে লাগিল।

এই ঘটনার অল্পদিন পূর্ব্বে গোয়ালন্দে একটী ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে পূজনীয় শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় ও এক্ষণে পরলোকগত কালীশঙ্কর সুকুল মহাশয় এই ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের উৎসব উপলক্ষে গোয়ালন্দে আগমন করিয়াছিলেন। গোয়ালন্দে যে কয়েক-জন ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসী ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহারা এই উৎসব উপলক্ষে বিশেষ ধুমধাম করিয়াছিলেন। এই উৎসবের পরেই গোয়ালন্দে মহা দলাদলি আরম্ভ হইল; হিন্দুসমাজভুক্ত মহোদয়গণ ব্রাহ্মসমাজের ঘোর বিরোধী হইয়া উঠিলেন। অবশ্য যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠায় যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন না। কিন্তু হিন্দুসমাজভুক্ত ব্যক্তিগণ এই কয়েকটী ভদ্রলোককে নানাপ্রকারে

নির্য্যাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের নিমন্ত্রণ বন্ধ হইল। এমন কি আমি জানি যে, এই দলের একজন ভদ্রলোক কোন হিন্দুসমাজ-ভুক্ত উকিলের বাসায় গমন করিয়া তাঁহার ফরাসে উপবেশন করিয়াছিলেন বলিয়া সেই ভদ্রলোকের সম্মুখেই হুঁকার জল ফেলিয়া দিবার জন্য উকিলবাবু চাকরদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন।

ফরিদপুর হইতে প্রত্যাগমনের সময় এই কথা আমি কাঙ্গালকে বলিয়া-ছিলাম। তিনি আমার কথা শুনিয়া বলিলেন, "তবে আজ আমার বাড়ী যাওয়া হইবে না। দুইদিন তোর বাসাতেই থাকিতে হইতেছে।" এই কারণেই কাঙ্গাল হরিনাথ দলবলসহ গোয়ালন্দে আমাদের ক্ষুদ্র কুটীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সন্ধ্যার সময় সকলে আমাদের বাসায় পৌঁছিলেন। আমার বড়দাদা এবং আমাদের বাসার সকলে হাতে স্বর্গ পাইলেন। রাত্রিতে কাঙ্গাল হরিনাথ বড়দাদার নিকট স্থানীয় দলাদলির কথা সমস্ত শুনিলেন। তাঁহার পর যখন সকলে শয়ন করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন, তখন কাঙ্গাল আমাকে ডাকিয়া বলিলেন "দেখ্, আমি এখানকার দলাদলি মিটাইয়া দিয়া তবে বাড়ী যাইব।" আমি বলিলাম "পারিবেন কি?" তিনি তখন গম্ভীরভাবে বলিলেন "নিশ্চয়ই পারিব। দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না, কি অমোঘ অস্ত্র তোরা আমার হাতে দিইছিস্। এই ফিকিরচাঁদ অস্ত্রে তোরা যে পৃথিবী জয় ক'রতে পারিস্, একথা কি এখনও বুঝ্‌তে পারিস্ নাই।" কাঙ্গালের কথাগুলি আমার নিকট দৈববাণী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। কতদিন চলিয়া গিয়াছে; জীবনের উপর দিয়া কত ঝড়, কত ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে; কিন্তু এখনও কাঙ্গালের সেই রাত্রির মূর্ত্তি আমার নয়নসম্মুখে প্রতিভাত রহিয়াছে। কত কথা ভুলিয়া গিয়াছি, কত লোকের কত উপকার বিস্মৃত হইয়াছি,
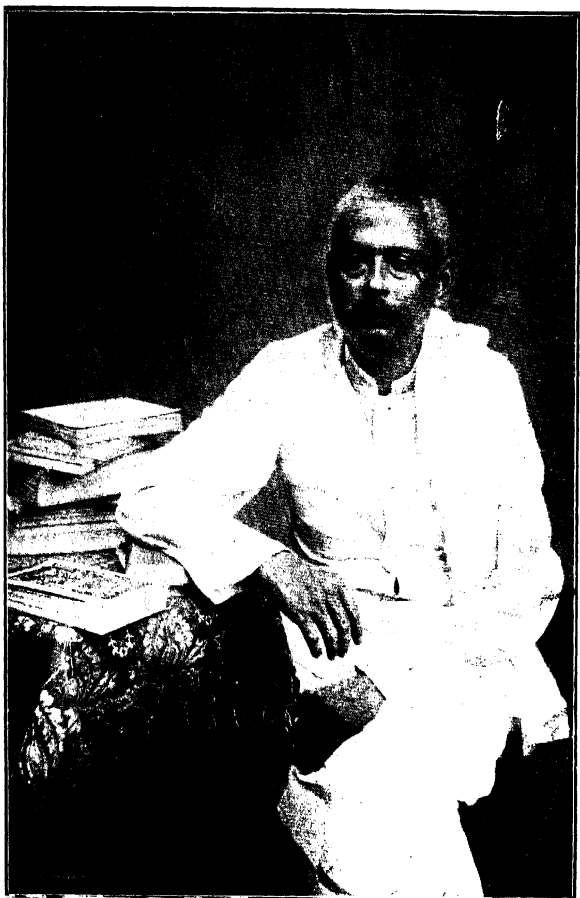
শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। ( মানসী হইতে )

তখনকার নিষ্কলঙ্ক জীবন কত কলঙ্ক-কালিমায় মলিন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কাঙ্গালের সে দিনের সে মূর্ত্তি আমি এখনও ভুলিতে পারি নাই। ভুলিতে পারি নাই বলিয়াই কাঙ্গালের এত শিষ্য থাকিতে সর্ব্বাপেক্ষা অযোগ্য আমি তাঁহার জীবন-কথা কীর্ত্তন করিবার প্রয়াসী হইয়াছি। কাঙ্গালের সেই গৌর কান্তি, সেই দীর্ঘ শ্মশ্রু, সেই তেজোব্যঞ্জক মূর্ত্তি তখন যেন এক স্বর্গীয় জ্যোতিঃতে পূর্ণ হইয়াছিল। আমার মনে হইতেছিল এই মূর্ত্তির সম্মুখে পাপ, তাপ, মলিনতা, দ্বেষ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা এক মুহূর্ত্তের জন্যও দাঁড়াইতে পারে না। এই মুখের বাণী শুনিলে সকলকেই অবনত-মস্তক হইতেই হয়।

আমাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া কাঙ্গাল বলিলেন "কি ভাবচিস্?" আমি অন্যমনস্কভাবে বলিলাম "না, তেমন কিছু না।" কাঙ্গাল আমাকে আর কিছু না বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ধীরে ধীরে সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া আমাদের বাড়ীর মধ্যে যাইতে লাগিলেন; আমিও তাঁহার অনুসরণ করিলাম। তিনি আমাদের বাড়ীর মধ্যে যাইয়া আমার দিদিকে ডাকিলেন। আমার দিদি কাঙ্গালের বড়ই প্রিয়পাত্রী ছিলেন। কাঙ্গাল যখন প্রথম কুমারখালীতে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন প্রথম যে কয়েকটী ছাত্রী তাঁহার নিকট পাঠ গ্রহণ করেন, আমার দিদি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতমা। আমার এই দিদিকে কাঙ্গাল মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত একই ভাবে দেখিয়াছিলেন।

আমার দিদিকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন "দেখ্, আমি একটা গান বাঁধব, তুই লেখ্ দেখি।" দিদি তখন তাড়াতাড়ি উঠানেই একখানি আসন পাতিয়া দিলেন এবং নিজে কাগজ কলম লইয়া বসিলেন। বাড়ীর মেয়েরা এবং আমি উঠানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কাঙ্গাল সুর করিয়া গান বলিয়া যাইতে লাগিলেন, দিদি লিখিয়া লইতে লাগিলেন। গানটী এই—

"ও ভাই, বল্‌রে বল, সবাই বল্‌রে।
দলাদলি, গালাগালি, ধর্ম্মের কি ফল রে।

১। স্ত্রী-পুরুষে যার ঐক্য নাই,
সহোদর যত ভাই ভাই,
সকল কাজেতে ঠাঁই ঠাঁই,
সমাজ টলমল রে;
এখন সাকার আর নিরাকার তুলে,
দিচ্ছ খড়ো ঘরে আগুন জ্বেলে,
বাতাস দিয়ে অনলে হাসে শত্রু দল রে।

২। অসীম আকাশ মাথার' পরে,
দেখ একবরে বিচার ক'রে,
সূর্য্য তারা ঘোরে ফিরে,
উদয় অস্তাচল রে;
ওরে, তারার মাঝে যারা আছে,
দেখ, তিনিও আছেন তাদের কাছে,
কেউ নাই তাঁর আগে পিছে,
সমান তাঁর সকল রে।

৩। কি ভাবে কে ভাবে কোথায়,
ঠিক নাহি হয় রে কথায়,
ভাবের ঠাকুর ভাবেতে পায়
প্রকাশ যে কেবল রে;
ওরে যে ভাবে যে হৃদয় গড়ে,
তিনি, সেই ভাবে তার হৃদ্-মন্দিরে,

নিজ স্বরূপ প্রকাশ ক'রে
করেন যে শীতল রে।

৪। শুন ভাই সাধুর বচন,
তিনি যে সাধনের ধন,
সাধন বিনে ধর্ম্মকথন
সকলই বিফল রে;
ওরে, যে ভাবে যে হৃদয় গড়,
কিন্তু, মনে প্রাণে সাধন কর,
বৃথা তর্ক বিচার ছাড়
বুদ্ধির কৌশল রে।

৫। যে রূপ সে রূপ স্বরূপ ধ'রে,
যদি সিদ্ধ হও ভাই, সাধন ক'রে,
তখন বক্তৃতা ক'রে,
খাবে না আর জল রে;
তখন, একটী কথার তেজোবলে,
কত পাষাণ শিলা যাবে গ'লে,
হবে এক সত্যবলে
পূর্ণ ধরাতল রে।

৬। কাঙ্গাল কয় সকাতরে,
ভারতের পায়ে ধ'রে,
সাধনহীন এ বিচারে
হবে গণ্ডগোল রে;
ওরে, সাধন ক'রে সযতনে,
যিনি, পেয়েছেন সেই সত্যধনে,

তাঁর উপদেশ বিনে
সকলই গরল রে।”

কাঙ্গালের গানের শব্দ পাইয়া দলের যাঁহারা বাহিরে নিদ্রা যাইবার আয়োজন করিতেছিলেন, তাঁহারা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; সকলে আমাদের বাড়ীর মধ্যের উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন আর কি—ঐ গান আরম্ভ হইল। আমার দাদা একটা লণ্ঠন হাতে লইয়া কাগজ দেখিয়া দেখিয়া গানের কথাগুলি বলিয়া দিতে লাগিলেন, আর দলের লোকেরা গান করিতে লাগিল। তখন পাড়ার সকলে ছুটিয়া আসিল; আমাদের বাড়ীর মধ্যের উঠানে আর লোক ধরে না; বাড়ীর মেয়েরা যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন, লজ্জা সঙ্কোচ কিছুই তখন থাকিল না। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! আমি অবাক্ হইয়া এই দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম—বুঝিতে পারিলাম .কাঙ্গালের একটু পূর্ব্বের সেই কথা “দেখ্‌তে পাচ্ছিস না, কি অমোঘ অস্ত্র তোরা আমার হাতে দিয়েছিস্।”

রাত্রি বোধ হয় এগারটার সময় গান আরম্ভ হইয়াছিল; রাত্রি দুইটা বাজিয়া গেল, তবুও গান থামে না; একজন যদি চুপ করে, তবে আর একজন গান ধরে। তিন চারিটি গানেই রাত্রি শেষ হইবার রকম হইল। তিনটার পর কাঙ্গালের হুঁস হইল; তিনি তখন প্রকৃতিস্থ হইলেন, তিনি তখন কোন্ এক আনন্দলোক হইতে আবার আমাদের পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিলেন। গান ভাঙ্গিয়া গেল, কাঙ্গাল বিশ্রাম করিতে গেলেন। দলের অন্যান্য লোকেরাও বিশ্রাম করিতে গেল।

তখন আমি আর প্রফুল্লচন্দ্র বাহিরে যাইয়া ঘাসের উপর বসিলাম। প্রফুল্ল বলিলেন “আজ রাত্রিতে আর ঘুম হইবে না, এস আমরা বসিয়াই রাত কাটাই।” কিন্তু কতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যায়।

প্রফুল্ল কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন "কা'লকার জন্যে আমিও একটা গান বাঁধি।" আমি বলিলাম "বেশ।" তখনই কাগজ কলম আলো ঘাসের মাঠে আনিয়া দিলাম, প্রফুল্লচন্দ্র গান বাঁধিলেন। সে গানটি এই—

"আছে কি কোন ঠিক তার,
কখন তোমার
নথী উঠে পেশ হইবে।

১। কিবা রাত কি সকালে,
সাঁজ বিকালে,
যে কালে সে মন করিবে ;
তখনই নথী ধ'রে, অবোধ তোরে,
জবাব দিতে তলব দিবে।

২। সে তলব চিঠি লয়ে,
হুকুম পেয়ে,
যখন ধেয়ে দূত আসিবে ;
তখন তোর আত্ম স্বজন, স্ত্রী পরিজন,
ক'রে যতন যে ঠেকাবে।

৩। যখন সেই আদালতে
জজের হাতে,
অবোধ রে তোর বিচার হবে ;
তখন তোর সপক্ষেতে সাক্ষী দিতে
ঝুটো কথা কে বলিবে।

৪। যাদের তুই ভেবে আপন,
করিস যতন,
তারা আপন না হইবে ;

দেখিস্ তোর বিপক্ষেতে ছয় সাক্ষীতে,
তাঁর সাক্ষাতে সাক্ষ্য দেবে।
৫। যাদের তুই হেলা করিস,
দেখ্‌তে নারিস্,
দেখিস্ রে বিষ শত্রু ভেবে ;
হয় ত তার কেহ গিয়ে, তোমার হ'য়ে
ঝুটো কথা তাঁয় বলিবে।
৬। ফিকিরচাঁদ বলে তোরে,
তৈয়ার হ' রে,
কি ব'লে জ'ব তখন দেবে;
হ'লে জ'ব খেঁচানেচা সাক্ষী কাঁচা,
পেয়ে সাজা ম্যাদে যাবে।"

এই গানটী শুনিয়া আমি বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলাম। গোয়ালন্দ সব-ডিবিজন স্থান ; সেখানে আমাদের পাড়ায় দিনরাত্রি শুধু মামলা আর মোকর্দ্দমা, মোকর্দ্দমা আর মামলা ; শুধু পেয়াদা আর আমলা, শুধু হাকিম আর শামলা। এ অবস্থায় শেষ মামলার সম্বন্ধে উকিল মোক্তার বাবুদিগকে সজাগ করিয়া দেওয়া বেশ সময়োপযোগী হইয়াছিল।

যাহা হউক, পরের দিন প্রাতঃকাল হইতেই গান আরম্ভ হইল। সে দিন রবিবার ছিল, আফিস কাছারী সমস্তই বন্ধ। কাহাকেও সংবাদ দিতে হইল না, কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিতে হইল না ; কাঙ্গালের গৃহে কাঙ্গালের গান, তাহাতে আর নিমন্ত্রণ কি !

কিসে কি হয়, তাহা আমরা কেমন করিয়া বলিব। প্রাতঃকালে প্রায় আটটার সময় গান আরম্ভ হইয়াছিল, অপরাহ্ণ তিনটা বাজিয়া যায়, তবুও কেহ উঠে না। ব্রাহ্ম দল, হিন্দু দল সকলেই উপস্থিত। যে

কয়েকজন প্রধান উকিল হিন্দুদলের নেতা ছিলেন তাঁহারা ঐ যে আসিয়া বসিয়াছিলেন, আর উঠিলেন না। সকলের প্রাণ মন ভিজিয়া গেল; কোন দলাদলি, কোন প্রকার হিংসা দ্বেষ কিছুই কাহারও মনে থাকিল না! তিনটার সময় যখন গান ভাঙ্গিয়া গেল, তখন কাঙ্গালের নিকট সকলেই উপস্থিত হইলেন। তিনি তখন করযোড়ে সকলকে বলিলেন "আপনাদের নিকট আমার একটা প্রার্থনা আছে।" বড় বড় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, যাঁহারা হিন্দু-সমাজপতি তাঁহারা একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন "অমন কথা বলিবেন না; আপনি কি অনুমতি করিবেন বলুন।" কাঙ্গাল সহাস্য বদনে বলিলেন "আমার বড় সাধ যে, আজ রাত্রিতে আমার এই ভাইয়ের বাড়ীতে আপনারা সকলে প্রীতি-ভোজন করেন।" তখন সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিলেন; এত দলাদলি, এত যে হুঁকার জল ফেলিয়া দেওয়া, এত যে ঠাট্টা বিদ্রূপ, সে সব কোথায় চলিয়া গেল। সকলেই সাগ্রহে বলিলেন "রাত্রিতে গানের পর আমরা সকলেই এখানে জলযোগ করিব।" আমার তখন ইংরাজ কবির সেই কথাটী মনে হইল—

"Those who came to scoff
Remained to pray"

তখন আমাদের ন্যায় গরিবের ক্ষুদ্র কুটীরে মহোৎসবের আয়োজন হইতে লাগিল। সে যে কি উৎসাহ, কি আনন্দ, তাহা আর বলিতে পারি না। আমাদের বন্ধুগণ, আমার প্রিয় ছাত্রগণ তখন পরম উৎসাহে মহোৎ-সবের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। কোথা হইতে কে কি পাঠাইতে লাগি-লেন, কে কি আনিতে লাগিলেন, তাহার ঠিকানা হইল না। আমরা দরিদ্র ব্যক্তি, আমাদের সাধ্য কি যে এতগুলি ভদ্রলোকের সামান্য জলযোগের ব্যবস্থাও করিতে পারি। কিন্তু কাহাকেও কিছু ভাবিতে হইল না, যাঁহার কার্য্য—যাঁহার মহোৎসব তিনিই সমস্ত যোগাইয়া দিতে লাগিলেন। দ্রব্যের

অভাব হইল না, পরিশ্রম করিবার লোকের অভাব হইল না—আমার এক একটি বালক ছাত্র তিনটি যুবকের কার্য্য একাকী করিতে লাগিলেন।

পাঁচটার সময় আবার গান আরম্ভ হইল। এবার অন্য রকমের গান হইতে লাগিল। এবার ফিকিরচাঁদ শুধু মায়ের নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সেই 'মা' নাম শুনিয়া পাষাণও গলিয়া যায়, মানুষ ত দূরের কথা। আমাদের মনে হইতে লাগিল সে স্থানের গগন পবন যেন 'মা' নামে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, চারিদিক্ হইতে সমস্ত প্রকৃতি যেন 'মা' নাম গান করিতেছে। এক একবার সমবেত জনমণ্ডলী যখন উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিতেছেন 'মা গো মা" তখন মনে হইতে লাগিল মা ব্রহ্মময়ী যেন সকলের সম্মুখে দণ্ডায়মানা থাকিয়া অভয় প্রদান করিতেছেন। সত্য সত্যই ফিকিরচাঁদের গানে তখন অসম্ভব সম্ভব হইয়াছিল।

রাত্রি এগারটার সময় গান শেষ হইল। তখন প্রীতিভোজন। সেও এক আশ্চর্য্য দৃশ্য। কিছু বিচার নাই, কোন অহঙ্কার নাই, কোন গর্ব্ব নাই,—সে সময়ে সব এক হইয়া গেল। মৃত্তিকাসনে বসিয়া ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, জ্ঞানী অজ্ঞানী, ব্রাহ্মণ শূদ্র—সকলে জলযোগ করিলেন; সকলেরই হৃদয় তখন মায়ের নামে নৃত্য করিতেছিল,—তখন কি আর ভেদাভেদ থাকে? মায়ের এমনই খেলা বটে। কাঙ্গাল এই মহোৎসব-ক্ষেত্রে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, আর এক এক বার বলিতে লাগিলেন—এ যে আনন্দ-বাজার।

অনেকে হয় ত মনে করিতে পারেন যে, কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের সঙ্গীতগুলি কেবল পরমার্থতত্ত্বমূলক। এ কথা ঠিক নহে। সাধারণতঃ আমাদের দেশে যে সমস্ত বাউলের দল আছে, তাহাতে পরমার্থতত্ত্বমূলক সঙ্গীত সকলই গীত হইতে শুনা যায়; সুতরাং বাউলের গান বলিলে লোকের মনে প্রধানতঃ দেহতত্ত্ব, পরমার্থতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ক গানের

কথাই উদিত হইয়া থাকে। ফিকিরচাঁদের গানের দল যখন স্থাপিত হয়, তখন পুরাতন বাউলের দলের অনুকরণেই ইহার গান রচিত হইতে থাকে। কিন্তু যিনি এই দলের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন, তিনি সত্বরেই বুঝিতে পারিলেন যে, এই ফিকিরচাঁদের গানের ভিতর দিয়া তিনি আমাদের দেশে অনেক তত্ত্বেরই প্রচার করিবেন। তাই তিনি সামাজিক, আধ্যাত্মিক, সাময়িক গান রচনা করিয়া এই গীতাবলীর অন্তর্ভুক্ত করেন।

এই সময়ে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষের তদানীন্তন বড়লাট মহামতি লর্ড রিপণ এ দেশ ত্যাগ করিয়া স্বদেশে গমন করেন। সে সময় এ দেশে যে ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা বর্ণনার অতীত। ফিকিরচাঁদ-সম্প্রদায় সেই সময়ে একটী গান প্রস্তুত করেন, এবং লর্ড রিপণ যখন দারজিলিং হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া যান, সেই সময়ে পূর্ব্ব-বঙ্গ রেলপথের পোড়াদহ ষ্টেশনে তাহা গান করেন। তখন কাঙ্গাল হরিনাথের "গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা" নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইত। সেই পত্রের ৬ই ডিসেম্বর শনিবারের (১৮৮৪) সংখ্যায় পোড়াদহ ষ্টেশনে ফিকিরচাঁদের অভ্যর্থনা সম্বন্ধে একজন পত্রপ্রেরক যে বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"গত মঙ্গলবার (২রা ডিসেম্বর ১৮৯৪) পোড়াদহ ষ্টেশনে লর্ড রিপণকে অভ্যর্থনা করিবার আয়োজন হয়। পোড়াদহের উৎসাহী জমিদারগণ এবং শিক্ষিত যুবকগণ দুই দিন পূর্ব্ব হইতেই ষ্টেশনগৃহ পত্র, পুষ্প এবং নিশানের দ্বারা সজ্জিত করিবার আয়োজন করেন। কুমারখালী হইতে গ্রামবার্ত্তার সম্পাদক মহাশয় স্বয়ং এবং সে স্থানের অনেকগুলি যুবক এখানে সমবেত হন। কুমারখালী হইতে আগত যুবকদিগের যত্ন দেখিয়া আমরা বাস্তবিকই আনন্দিত হইয়াছি। স্থানীয় ভদ্রলোকগণও অনেক আয়োজন করিয়াছিলেন। গ্রামবার্ত্তা সম্পাদক মহাশয়, বিখ্যাত কাঙ্গাল

ফিকিরচাদ ফকিরের দল সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। রিপণের জন্য তাঁহারা পূর্ব্বেই একটি সুন্দর হৃদয়গ্রাহী গান প্রস্তুত করিয়া রক্তাক্ষরে ছাপাইয়া আনিয়াছিলেন! শুনিলাম লর্ড রিপণকে দিবার জন্য তাঁহারা সেই গান অতি সুন্দর কাগজে ছাপাইয়া আনিয়াছিলেন; কিন্তু পূর্ব্বে কোন বিশেষ বন্দোবস্ত না থাকায় এবং গাড়ী অতি অল্পক্ষণ ষ্টেশনে থাকায়, তাঁহারা সফলমনোরথ হইতে পারেন নাই।

"বেলা ১১টা ১৯ মিনিটের সময় লর্ড সাহেবের গাড়ী পোড়াদহ ষ্টেশনে লাগিল। ইহার পূর্ব্ব হইতেই কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের দল ষ্টেশন-প্রাঙ্গণে গান আরম্ভ করিয়াছিলেন। গাড়ী ষ্টেশনে আসিলে, সকলে "জয় রিপণের জয়" রবে গগন ভেদ করিতে লাগিলেন। ফিকিরচাঁদের দল একবার রিপণের জয়ধ্বনি করে, আবার ক্ষীণ কণ্ঠ ঊর্দ্ধে তুলিয়া গান ধরে। সে সময়ে যে কি সুন্দর দৃশ্য হইয়াছিল, তাহা লেখনী লিখিতে অক্ষম; যদি ফটোগ্রাফ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে সেই ছবি তুলিতে পারিতাম। সকলের মুখে এক ধ্বনি। বাষ্পীয় রথ অধিকক্ষণ এ আনন্দ উপভোগ করিতে দিল না। সমাগত লোকে রিপণের গাড়ীতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল, এবং গাড়ীর মধ্য হইতে লেডি রিপণ আনন্দবদনে দুই হস্তে অভিবাদন করিতে লাগিলেন। গাড়ী ছাড়িয়া গেল। রিপণ-নামাঙ্কিত নিশান হস্তে গান গাইতে গাইতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে কাঙ্গালের গানের দল চলিয়া গেল।

"এ দিকে পোড়াদহের শ্রদ্ধেয় জমিদার মহাশয়দিগের সাহায্যে এবং উদ্যোগে ষ্টেশনে চাউলের একটী স্তূপ করা হইয়াছিল, এবং কিছু টাকাও সংগ্রহ করা হইয়াছিল। সেই চাউল এবং টাকা অন্নাভাবগ্রস্ত দরিদ্র লোকের মধ্যে বিতরিত হইল। তাঁহারা অনাথাদিগকে বিতরণ করিবার জন্য কিছু নূতন কাপড়ও আনিয়াছিলেন। সত্যই পোড়াদহের

বাবুদিগের যত্ন এবং একাগ্রতা দেখিয়া আমার হৃদয় পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। জগদীশ্বরের নিকট তাঁহাদের দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

"সেই দিন অপরাহ্নকাল স্থানীয় জমিদার বাবু বিধুভূষণ বসু মহাশয়ের বাটীতে একটী বৃহৎ সভা আহুত হয়। সেই সভায় কুষ্টিয়া উপবিভাগের কৃষি সম্বন্ধে উন্নতি করিবার উপায় অবলম্বন করা স্থির হয়। পরে একটী সুন্দর ভারতসঙ্গীত গীত হয়। সঙ্গীতান্তে কুমারখালী হইতে আগত শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় লর্ড রিপণ এবং কৃষিদিগের সম্বন্ধে একটী অনতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তৎপরে প্রসিদ্ধ কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ ফকীর অনিত্যতা এবং ভক্তিমূলক গান করিয়া শ্রোতৃবর্গকে পরম পরিতুষ্ট করেন। রাত্রি প্রায় দশটার সময়ে গান শেষ হয়।

ফকিরের দল ষ্টেশনে যে গানটী করেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"দেশে চলিলে মহামতি রিপণ।
রামরাজ্য-সম প্রজা করিয়ে পালন।

১। সুশাসনে এ ভারতে, ছিল প্রজা নিরাপদে,
( তব ন্যায়পরতায়, সাম্যনীতি )
তোমার বিরহে কাঁদে নরনারীগণ।

২। আমরা কাঙ্গাল কাঙ্গাল বেশে. এসেছি তব উদ্দেশে,
( হের কৃপানয়নে, সাধারণ দেশের দশা )
দেশের দশা প্রকাশ বেশে, কর নিরীক্ষণ।

৩। হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা, দেখাতে নাহি ক্ষমতা,
( আমরা পল্লীবাসী হে ),
( জ্ঞান অর্থহীন ) ( ধর চক্ষের জল হে ),
( অন্য সম্বল নাই )
রাজভক্তি সরলতা ভারতবাসীর ধন।

৪। ভিক্টোরিয়া মাতা যখন, জিজ্ঞাসিবে ব'ল তখন,
( কেবল নাম রয়েছে, সোণার ভারত ) (সকল হারায়েছে)
সোণার খণি নাই আর এখন, ভারত-ভুবন !

৫। দুর্ভিক্ষ প্রতি বছরে, অন্ন বিনা প্রজা মরে,
(মায়ের কাছে ব'ল এই, বিক্টোরিয়া)
ম্যালেরিয়া মহাজ্বরে, নাশে প্রজাগণ।

৬। সহায়হীনা শুকরমণি, পরম সতীরমণী,
( তার কি দশা হলো হায় ! )
( বল্‌তে হৃদয় ফাটে )
হরিয়ে সতীত্বমণি বধিল জীবন।

৭। আর যত অত্যাচার, সকলি তব গোচর,
( কিবা নিবেদিব হে, তুমি সকল জান )
দেশে গিয়া গুণাকর, করিবে স্মরণ।

৮। ভারতের কপাল মন্দ, অস্ত্রাইনে হস্ত বন্ধ,
( তাদের একি দশা হে ) ( মহারাণীর প্রজা হয়ে )
পশু হস্তে প্রজাবৃন্দ হারায় জীবন।

৯। রাজরাজেশ্বরী হয়ে, থাকুন মাতা ভিক্টোরিয়া,
( প্রার্থনা করি এই, বিভুপদে )
এ অত্যাচার দয়া করে, করুন নিবারণ।

১০। তিনি তোমায় করুন রক্ষে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে,
( যিনি আত্মার আত্মাতে, এই চরাচরের )
কাঙ্গাল-ফিকিরের এই ভিক্ষে, কাতর নিবেদন।"

লর্ড রিপণকে উপহার দিবার জন্য উৎকৃষ্ট কাগজে ও সুন্দর কালীতে ছাপিয়া ফিকিরচাঁদের দল যে গানের কাগজ আনিয়াছিলেন, তাহা

পোড়াদহ ষ্টেশনে লর্ড রিপণের হস্তে দেওয়ার সুবিধা হয় নাই বটে, কিন্তু বড় লাটের স্পেশেল ট্রেণের প্রত্যেক গাড়ীর মধ্যে ৫০।৬০ খানি করিয়া মুদ্রিত গানের কাগজ দেওয়া হইয়াছিল। গাড়ী যে অল্প সময়ের জন্য ষ্টেশনে থাকিবার কথা ছিল, সমাগত ভদ্রলোকগণের অত্যধিক আগ্রহে তাহা অপেক্ষাও অধিক সময়ের জন্য ষ্টেশনে গাড়ী রাখিতে হইয়াছিল। গার্ড সাহেব বারবার নিশান দেখাইয়াও দ্রুতগামী দারজিলিং মেলকে চালাইতে পারেন নাই। সৌভাগ্যক্রমে আমি ঐ ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলাম, এবং আমিই ফিকিরচাঁদের দলের প্রতিনিধি হইয়া গিয়াছিলাম। তাহার পর আমি স্বয়ং কলিকাতায় গমন করিয়া, ফিকিরচাঁদের ঐ গান যথারীতি বড়লাট বাহাদুরের সমীপে প্রেরণ করি। সেই অভিনন্দন-গীতির প্রাপ্তি-স্বীকার করিয়া, বড়লাট বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী মহোদয় আমাদিগকে যে পত্র লেখেন, তাহার অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

**LARKIN'S LANE**

*Calcutta, 11th December, 1884.*

SIR,

I am directed to ackonwledge the receipt of your letter of the 5th instant and to request you to be so good as to convey to the inhabitants of Comercolly His Excellency the Viceroy's thanks for the song in Bengali, which they have presented to him.

I am Sir

*Yours obediently*

*Sd.* **H. W. Primrose**

*Private Secretary to the Viceroy.*

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর শনিবারে যে 'গ্রামবার্ত্তা' প্রকাশিত হয়, তাহাতে কাঙ্গাল হরিনাথ মহামতি লর্ড রিপণ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লেখেন আমরা নিম্নে তাহার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ইহা হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, কাঙ্গাল হরিনাথ দুর্ব্বল হস্তে লেখনী ধারণ করিতেন না, সংবাদপত্রের সম্পাদক হিসাবে তাঁহার আসন অতি উচ্চে অবস্থিত ছিল।

"দরিদ্রের সহায়, অনাথের আশ্রয়, মহামতি লর্ড রিপণ ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া চলিলেন। এত দিন এই দেশে বাস করিয়া তিনি কি কার্য্য করিয়াছেন তাহা আর আজ নূতন করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই। ভারতবর্ষে এমন লোক অতি কমই আছেন, যিনি তাঁহার কার্য্যকলাপের সহিত পরিচিত নহেন। আজ রিপণের গুণ-গানের দিন নহে। যতদিন ভারতে ইংরাজ-রাজত্ব থাকিবে, যতদিন ভারতবাসী মনুষ্য থাকিবে, তত-দিন রিপণের নাম কেহ ভুলিবে না। কোন দিন যদি দৈবদুর্ব্বিপাকে ভারত ইংরাজ-করভ্রষ্ট হয়, সে সময়েও রিপণের নাম করিয়া ভারতবাসী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিবে। আজ আমাদের কাঁদিবার দিন, আজ আমা-দের প্রাণের বেদনা জানাইবার দিন। রিপণ স্বদেশে চলিলেন, এতদিন পর্য্যন্ত এই উষ্ণপ্রধান দেশে গুরুভার মস্তকে লইয়াছিলেন, এখন তাঁহার বিশ্রামের দরকার, এখন তাঁহার শান্তির দরকার; ইহা আমরা বুঝি; কিন্তু বুঝিলে কি হয়, মনে যে তাহা বলে না; আজ ভারতের যে অবস্থা, আজ আর্য্যসন্তানের সহিত শ্বেতমুখের যে সদ্ভাব, তাহাতে রিপণের ন্যায় লোককে ছাড়িয়া দিতে যে মনে নানা আশঙ্কার উদয় হয়। কত রাজা আসিলেন, কত গভর্ণর আসিলেন, ইংরাজের আমলে ভারতের রাজতক্তে কত রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত বসিলেন, কিন্তু রিপণের মত কেহ কি আসিয়া-ছিলেন, এমন উদার শাসনকর্ত্তা কি ভারতে আসিয়াছিলেন? অতীত

ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখিলে এমনটী ত আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

"এতদিন ইংরাজের রাজত্ব হইল, কোম্পানীর আমলে ওয়ারেণ হেষ্টিংস হইতে এতগুলি গভর্ণর জেনারেল হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু কেহ কি রিপণের ন্যায় ভারতবাসীর হৃদয় মন অধিকার করিতে পারিয়াছেন। প্রতিধ্বনি একই উত্তর করিতেছে—না। কেহ কি কখন শুনিয়াছ, ভারতবাসী কোন ইংরাজকে স্কন্ধে করিয়া বহিয়া লইয়া গিয়াছে। যাহা কোন দিন শুন নাই, যাহা কোন দিন দেখ নাই, আজ তাহা প্রত্যক্ষ কর। ঐ দেখ আলিগড়ের সে চিত্র এখন সম্মুখে বিদ্যমান বোধ হইতেছে। ইচ্ছা হইতেছে পাঠককে সে ছবি আঁকিয়া দেখাই; আমাদের সহযোগ বঙ্গবাসী সে চেষ্টা করিয়াছেন। ঐ দেখ, সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ রিপণকে এক তাঞ্জামে বসাইয়া স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইতেছেন। ভারতে এ এক নূতন দৃশ্য। ইতিহাসের পৃষ্ঠা উদ্ঘাটিত কর, এ দৃশ্য তাহার পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখ। কাহার সাধ্য এ দৃশ্য দেখিয়া এখনও বলিবে, ভারতবাসী রাজভক্ত নহে। প্রত্যক্ষের নিকট প্রমাণ নাই। সমস্ত ভারতবর্ষে আজ যে আয়োজন হইতেছে, ক্ষুদ্র পল্লী-গ্রামের লোকেরা আজ যে আয়োজন করিতেছে, তাহা তুমি ইংলিসম্যান পাইওনিয়র দেখিতেছ না। কিন্তু ভাই! আজ একবার কষ্ট স্বীকার করিয়া আমাদের দেশে আইস, দেখিয়া যাও কি হইতেছে। রিপণের জন্য লোকে কত দুঃখ করিতেছে। আমরা পল্লীবাসী, আমরা কোথায় টাকা পাইব। দেশের যে অবস্থা হইয়াছে তাহাতে দিন গেলে অন্ন মিলা ভার হইতেছে। আমরা কি দিয়া রিপণের অভ্যর্থনা করিব। ধনবল নাই, এতদিন পর্য্যন্ত যে কষ্টে দিন গেল তাহা কাহাকে বলিব; এই দুঃখ দারিদ্র্য-ভারাক্রান্ত হৃদয় তোমার নিকট উদ্ঘাটিত করিয়া দিতেছি। তুমি দেখ; দেখ, এ হৃদয়েও তোমার জন্য স্থান আছে। আমাদের হৃদয়ের

ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা গ্রহণ কর। তুমি অনেক বহুমূল্য উপহার পাইবে, তোমার প্রতি রাজা বাদশাহ অনেক প্রকারে সম্মান প্রদর্শন করিবেন; কিন্তু আমরা তোমার নাম গান গাইব, তোমার নামের গান প্রস্তুত করিয়া বালক বালিকাদিগকে শিখাইব, তোমার নাম তোমার কীর্ত্তি ঘোষণা করিব।"

কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের বাউলের দলের ইতিহাস ও কয়েকটী বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছি। ফিকিরচাঁদের দল আরও কোন্ কোন্ স্থানে গমন করিয়াছিলেন, কোথায় কি হইয়াছিল, কি উপলক্ষে কোন্ গান রচিত হইয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিতে গেলে, প্রস্তাব ক্রমেই দীর্ঘ হইয়া পড়িবে; বিশেষতঃ যেমন করিয়া যেটী বলিলে ঠিক হয়, হৃদয়গ্রাহী হয়, আমার দুর্ব্বল লেখনী তাহা বলিতে পারিতেছে না। আমি বড়ই সঙ্কোচের সহিত এই পবিত্র ভূমিতে পদার্পণ করিয়াছিলাম; পদে পদে আমার দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়াছি; সর্ব্বদাই ভয় হইয়াছে আমি হয় ত এই দেবোপম চরিত্র যথাযথ চিত্রিত করিতে পারিতেছি না—আমি মহাপাপে লিপ্ত হইতেছি। মধ্যে মনে করিয়াছিলাম, যেটুকু বলিয়াছি তাহার পর আর বলিব না, আর চেষ্টা করা আমার পক্ষে শোভন ও সঙ্গত হইতেছে না। শুধু ফিকিরচাঁদের কথাই এতদিন বলিলাম, তবুও কত বলিবার আছে। ইহার পর কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ডবেদের কথা বলিতে হইবে; তাহার পর বাঙ্গালা-সাহিত্যে কাঙ্গাল হরিনাথের আসন কোথায় বলিতে হইবে; তাহার পর গ্রামবার্ত্তার সম্পাদক রূপে কাঙ্গাল হরিনাথ কি ভাবে দেশের ও দশের সেবা করিয়াছিলেন, কেমন তেজের সহিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন; এ সকল কথা বলিতে হইবে; সর্ব্বশেষে কাঙ্গালের সাধনার কথা বলিতে হইবে। এত কথা বলিবার আছে, কিন্তু আমার শক্তির অভাব, আমার বিদ্যা-বুদ্ধির অভাব ভাবিয়া আমি সঙ্কুচিত হইতেছি।

ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে ভাবিব। অপাততঃ আমি কাঙ্গালের কয়েকটী গান পাঠকদিগকে উপহার দিব।

## শক্তিপূজা।

শক্তি পূজা কথার কথা না।
যদি কথার কথা হ'ত, চিরদিন ভারত
শক্তিপূজে শক্তিহীন হ'ত না।

১। কেবল ডাকের গয়নায়, ঢাকের বাজনায় শক্তিপূজা হন না;
এক মনোবিল্বদলে, ভক্তিগঙ্গাজলে,
শতদল দিলে হয় সাধনা। (হৃদয়)

২। দিলে আতপান্ন, কি মিষ্টান্ন, মা যে তাতে ভোলেন না;
কেবল জ্ঞানদীপ জ্বেলে, একান্ত ধূপ দিলে
ব্রহ্মময়ী পূর্ণ করেন কামনা। (ও ভাই)

৩। বনের মহিষ অজা, মায়ের বাছা, মা সে বলি লন না;
যদি বলি দিতে আশ, স্বার্থ কর নাশ,
বলিদান কর বিলাস-বাসনা। (ও ভাই)

৪। কাঙ্গাল কয় কাতরে, জা'ত বিচারে, শক্তিপূজা হয় না;
সকল 'বর্ণ' এক হ'য়ে, ডাক মা বলিয়ে,
নইলে মায়ের দয়া কভু হবে না। (ও ভাই)।

## বলিদান।

বলি দাও বলে সবে, বলি কি তা বোঝে না।
বলি কারে বলে ভেবে দেখ না।

১। বৃক্ষলতা-বনস্পতি যত দেখ জগতে,
বলিদানে জগৎমাতার পূজা করে তাবতে;

ফল শস্য করি দান, ওষধি হারায় প্রাণ ;
বিনা আত্ম-বলিদান পূজা সিদ্ধ হয় না, হয় না।

২। রক্তদানে শক্তিপূজা করে যে সব বলবান্,
তারা, শক্তি নাম ধরে, লোকে করে তাদের কীর্ত্তি গান,
রাখিতে ধর্ম্মের মান, করে যারা প্রাণদান,
করে তারা বলিদান ছাড়ি সংসার-বাসনা কামনা।

৩। কাঙ্গাল বলে বনপশু বলি দেয় রে যে জনা,
তারা, আপন ঘরের মাঝে কত পশু আছে জানে না ;
মন তুমি দাও বলি, রাগ দ্বেষ-মহিষ বলি,
লোভ-নরবলি, কাম-অজবলি কল্পনা জল্পনা।

## পূজা—আয়োজন।

তবে, মন্‌রে আমার কর্ আয়োজন ;
যদি পূজবি মায়ের চরণ।
আছে, ময়লা ধ'রে, যতন ক'রে মাজরে ক'খানা বাসন।
( যেন থাকে না ; পূজার বাসনে ময়লা )

১। ওরে এম্‌নি ক'রে মাজ্‌বি বাসন,
দেখা যায় রে আপন বদন ( মন আমার )
তখন বাসন মাঝে দেখ্‌বি মায়ের সেই চরণ ;
ও রে, বাসনে ময়লা থাকিলে, মায়ের চরণ নাহি মিলে ;
মালন আয়নাতে দেখ্‌লে হয় না কভু মুখ দরশন।

২। ওরে, সত্ব রজঃ তম ব'লে,
আন্‌রে বিল্বদল তুলে, ( মন আমার )
সেই বিল্বদল ধোও নয়ন-গঙ্গাজলে ;

ভক্তিকে করিয়ে চন্দন, তাইতে আবার কর লেপন ;
নইলে পূজা হবে না মন, বৃথা যাবে সব উপকরণ।

৩। কাঙ্গাল বলে নয়রে সোজা,
খাট্‌নি বিনে হয় না পূজা, ( মন আমার )
খাটে যে জন পার হয় সে জন বিরজা ;
বিরজা পার হ'লে পরে বাসনেতে ছায়া পড়ে,
তখন, রূপে ভুবন দীপ্ত করে, শীতল হয় রে তাপিত জীবন।

## পূজা উপদেশ।

ক'রে ভ্রূকুটী ভঙ্গি, বলে ভৃঙ্গী অচলরাজ হিমাচলে।

১। তুমি পৃথিবীর গোড়া, উচ্চ-চূড়া, হয়েছ যাঁর কৃপাবলে ;
পাষাণে বেঁধে হৃদি, বৎসরাবধি সেই মায়েরে আছ ভুলে।

২। তোমাদের রাজরাজড়ার থাকে না আর, কোন জ্ঞান বিষয় পেলে ;
বিষয়ের বিষয় যিনি, তুচ্ছ তিনি ভাবিলে বিষয়ের বলে।

৩। তুমি যে বসন ভূষণ, ধন রতন, দিচ্চ যাঁর ভুলাতে ছলে,
ও ত সব দেওয়া যে তাঁর, দেখি তোমার, গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে।

৪। পেলে মিষ্টান্ন অন্ন, সুপ্রসন্ন, না হন তিনি কোন কালে ;
তিনি, হৃদয়ের নিধি, নিরবধি সদয় হন হৃদয় দিলে।

৫। কাঙ্গাল কয় ভৃঙ্গীর ভঙ্গি দেখে শৃঙ্গি গিরিরাজ ! কি ভয় পেলে ;
তুমি মন-বিল্বদলে, নয়ন-জলে পূজ, ডাক দুর্গা ব'লে।

## উদ্বোধন।

নিদ্রাগত কত কাল রবে জননি ! মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনি !

১। যদি, মা তুমি ঘুমাও, জেগে না জাগাও,

তবে ত জাগে না কোন প্রাণী ;

একবার হ'য়ে সুপ্রসন্ন, হও মা চৈতন্য,

চৈতন্য-আনন্দ-স্বরূপিণি !

২। মূলাধারে অন্নকোষ, ছেড়ে একবার এস,

প্রাণময় কোষে প্রাণতোষিণি !

আমার মনোময় কোষে, মনানন্দে ব'সে

তন্দ্রা হর তন্দ্রারূপিনী

৩। ও মা, করুণা প্রকাশ, মনকোষ নাশ

জ্ঞানকোষে এস জ্ঞানদায়িনি !

জীবের জ্ঞানকোষস্থল, শ্বেত শতদল,

বীণা বাজাও মাগো বীণাপাণি !

৪। ও মা, আনন্দময় বাসা, তাতেও বদ্ধদশা,

প্রাণের ভালবাসা না পায় জ্ঞানী ;

মম, এ কোষ ভাঙ্গিয়ে, প্রণব ভেদিয়ে,

সদাশিবে গিয়ে মা আপনি। (নিজ বামে বস)

৫। ওরে, কাঙ্গাল বলে নাম, সদাশিব ধাম,

রাসচক্র নাম, সাধকের বাণী ;

তথা, শিবে শোভে গৌরী, শ্যামে রাধা প্যারী,

নেচে বেড়ায় গোপিনী যোগিনী।

## একাগ্রতা।

যদি ডাকার মত পারিতাম ডাক্‌তে।

তবে কি মা ! এমন ক'রে লুকায়ে থাক্‌তে পারতে।

কাঙ্গাল হরিনাথ। ( মানসী হইতে )

১। আমি নাম জানিনে ডাক জানিনে,
জানিনে মা! কোন কথা ব'ল্‌তে;
তোমায়, ডেকে দেখা পাইনে তাইতে,
আমার জনম গেল কাঁদ্‌তে।

২। দুখ্‌ পেলে মা তোমায় ডাকি,
আবার সুখ পেলে চুপ করে থাকি ডাক্‌তে;
তুমি মনে ব'সে মন দেখ মা!
আমায় দেখা দাও না তাইতে।

৩। ডাকার মত ডাকা শিখাও,
না হয় দয়া ক'রে দেখা দাও আমাকে;
আমি, তোমার খাই মা! তোমার পরি,
কেবল ভুলে যাই নাম ক'র্‌তে।

৪। কাঙ্গাল যদি ছেলের মত
মা! তোরে ছেলে হ'ত তবে পার্‌তে জান্‌তে;
কাঙ্গাল জোর ক'রে কোল কেড়ে নিত,
নাহি সর'ত বল্লে স'রতে।

## দৃঢ়তা।

ও মা! নই আমি সে ছেলে।
যার আছে সাধনের জোর, সে কি মা! তোর
ভয় করে, তুই ভয় দেখালে।

১। ও মা! সত্যকালে সুরথ রাজা, রাজ্য হারিয়ে করে তোমার পূজা,
বৈরিকে ব'ধে প্রজা রাজ্য ধন তাহায় দিলে;

আবার, বৈশ্যকে উদ্ধারের তরে, তুমি করলে কীর্ত্তি এ সংসারে,
ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে তারে মা গো ! ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে তারে মুক্তি দিলে।

২। যদিও অনেকদিন সেই গত ত্রেতা, তবু আছে মা পুরাণে গাঁথা,
রাবণ হরিল সীতা, যুদ্ধ হয় সাগরকূলে ;
সেই দেবদ্বেষী রাবণেরে, তুই কোলে নিলি রথোপরে,
কি গুণে কোলে নিলি মা গো, কি গুণে কোলে নিয়ে দিলি ফেলে।

৩। ও মা ! কালকেতু এক ব্যাধের ছেলে, তারে অভয় দিয়ে
করলি কোলে,
আমার দিক্ হীন ব'লে দোষ আছে কি চাহিলে ;
যদি চাইলে হয় তোর দোষের কথা, তবে বল মা !
আমি দাঁড়াই কোথা,
কলঙ্ক হবে তোমার মা গো, কলঙ্ক হবে আমায় ফেলে গেলে।

৪। ও মা ! যাঁর স্মৃতিতে বঙ্গশাসন, সেই দ্বিজপুত্র রঘুনন্দন,
করলি তার দুঃখমোচন, কলিকার আগুণ যোগালে ;
আবার সত্য মিথ্যা জান তুমি, ইহা লোকের মুখে শুনি আমি,
প্রসাদের বেড়ার বাঁধন মা গো ! রামপ্রসাদের বেড়ার বাঁধন
ফিরিয়েছিলে।

৫। আজ, ফিকিরচাঁদ বাজায়ে বগল, বলে যে ধ'রেছি চরণযুগল,
ছাড়ব না হ'ক গণ্ডগোল, তুই যদি না দিস্ ফেলে ;
যদি না রাখিস্ এই ছেলের কথা, তবে খাস্ মা তোর ভক্তের মাথা ;
দেখ্ আজ কেমনে যাস্ মা গো ! দেখ্‌ব আজ কেমনে যাস্
কথা ঠেলে।

রাজসাহীতে প্রতি বৎসর বড়দিনের সময় ব্রাহ্ম-সমাজের উৎসব হইয়া থাকে। যখন শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের পিতা পরলোকগত মথুরা-

নাথ মৈত্রেয় মহাশয় জীবিত ছিলেন, তখন তিনিই ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন। তখন প্রতি বৎসরই উৎসব উপলক্ষে আমরা রাজসাহীতে মিলিত হইতাম। বড়দিনের ছুটীটা বড় আনন্দেই কাটিয়া যাইত। একবার সেই আনন্দের মাত্রাটা অত্যন্তই বাড়িয়া গিয়াছিল। তাহারই বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

বড়দিনের ছুটীর কয়েকদিন পূর্ব্বে শ্রীমান্ অক্ষয় এবং তাহার পূজনীয় পিতৃদেব আমাকে পত্র লিখিলেন যে, সেবার ব্রাহ্ম-সমাজের উৎসবের সময় রাজসাহীতে অনেক মহাজনের সমাগম হইবে। পূজনীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সপরিবারে যাইবেন; কুমারখালী হইতে কাঙ্গাল হরিনাথ ফিকিরচাঁদ ফকিরের দল সহ যাইবেন; উত্তরবঙ্গের নানাস্থান হইতে অনেক সাধু ভক্তের সমাগম হইবে। অতএব আমাকে একটু শীঘ্রই রাজসাহী যাইতে হইবে। আমি দেখিলাম, এমন শুভসম্মিলন যখন তখন ঘটে না। যখন রাজসাহীর অধিবাসীবৃন্দ এতগুলি সাধুসমাগমের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তখন আমার মত অসাধু ব্যক্তি সেখানে গেলে অন্ততঃ তাঁহাদের গায়ের বাতাসেও কয়েকটা দিন ভাল ভাবে কাটাইয়া আসিতে পারিবে। আমি তখন কাঙ্গালকে পত্র লিখিলাম; কিন্তু সে পত্র তাঁহার নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তিনি দলবলসহ রাজসাহী যাত্রা করিয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয় যাইতেছেন শুনিয়া তিনি আর বিলম্ব করিতে পারেন নাই—উভয়ের মধ্যে এমনই একটা আকর্ষণ ছিল। কুমারখালী হইতে যখন সংবাদ পাইলাম না তখন বড়দিনের ছুটী আরম্ভ হইবার দুই তিন দিন পূর্ব্বেই অনুগ্রহ-বিদায় গ্রহণ করিয়া রাজসাহীতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। অক্ষয়কে 'তার' করিলাম; কারণ বড় দিনের সময় পূর্ব্বে বন্দোবস্ত না করিলে, রাজসাহীতে যাওয়া বিশেষ কষ্টকর ব্যাপার ছিল; এখনও সে অসুবিধা দূর হয় নাই। ষ্টীমারে

যাইতে হইলে, রাজসাহী সহর হইতে কয়েক মাইল দূরে ষ্টীমার হইতে নামিতে হইত, তাহার পর যাহার জন্য যেমন ব্যবস্থা থাকে তাহা হইত। এদিকে ষ্টীমারও সকল দিন যাইতে পারিত না; পদ্মার চরে ঠেকিয়া অনেক দিন তাহাকে বন্দী-দশায় থাকিতে হইত। এই কারণেই পূর্ব্বে বন্দোবস্তের প্রয়োজন হইত। শ্রীমান্ অক্ষয় আমার 'তারের' জবাবে জানাইলেন যে, দেবী রাণীভবানীর নাটোর মোকামে আমার জন্য গো-যান সজ্জিত থাকিবে। তথাস্তু!

একদিন অপরাহ্নকালে নাটোর নামিয়া গো-যানে আরোহণ করিলাম। পরমানন্দে ঝাঁকাঝাঁকি খাইতে খাইতে রাত্রি প্রায় একটার সময় বেদনাক্লিষ্ট দেহখানিকে অক্ষয়ের বাসায় পৌছাইয়া দিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম, সে রাত্রিতে আমার জন্য পূর্ণ অনাহারের সুব্যবস্থা ভগবান করিয়াছেন; কিন্তু তখন ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, ভগবানের দুইজন প্রতি-নিধি—দুইজন সাধক ভৃত্য আমার জন্য—আমার ন্যায় অধমের প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলেন। সেই দুইজন আর কেহই নহেন—পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ, আর কাঙ্গাল হরিনাথ। সকলেই নিদ্রিত হইয়াছেন,—রাত্রি দশটা এগারটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া সকলেই স্থির করিয়াছিলেন যে, কোন কারণে হয় ত আমি সেদিন যাইতে পারি নাই; কিন্তু তাঁহারা সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। আমি পৌছিয়া দেখি, দুইজনে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। আমি দুইজনকে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলাম। তখন আর সকলেও জাগিয়া উঠিলেন। আমি তত রাত্রিতেই আহার করিলাম।

সুদীর্ঘ পথ গো-যানের সহিত যুদ্ধ করিয়া আমি অবসন্ন হইয়া পড়িয়া-ছিলাম; রাত্রিও প্রায় তখন দুইটা; সুতরাং সে সময়ে বিশ্রামের নিতান্তই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু কাঙ্গাল আদেশ প্রচার করিলেন

যে, অবশিষ্ট রাত্রিটুকু আর ঘুমান হইবে না, ভগবানের নাম গান করিয়াই ঐ সময়টুকু অতিবাহিত করিতে হইবে। বিজয়কৃষ্ণও তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। যিনি যেখানে বিশ্রাম করিতেছিলেন, সকলেই উঠিয়া আসিলেন। তখন গান আরম্ভ হইল। গানটীর কথা এখনও আমার মনে আছে। তাহা এই—

"তুমি আমায় ভুল না হে, ও নাথ,
এখন আমার এই কথা।
১। ও নাথ, তোমার অনেক, তুমি হও,
অনেকের পিতামাতা ;
কিন্তু, তুমি কেবল আমার একা
আমার বোঝ প্রাণের ব্যথা।
২। ও নাথ, আমি তোমায় ভুল্‌লে, তোমার
যায় না হে মমতা ;
কিন্তু তুমি আমায় ভুল্‌লে, আমার
সকল হয় যে বৃথা।
৩। আমি, সুখে দুঃখে যে ভাবে হে,
থাকি যথা তথা ;
যেন, তোমার নামের মালা, আমার
প্রাণে থাকে গাঁথা।
৪। আমি, বুঝি না হে তন্ত্রমন্ত্র,
শাস্ত্র-তত্ত্ব বৃথা ;
কেবল তুমি আমার আমি তোমার
কাঙ্গালের বেদ-গাথা।

গানের গোড়াটা বেশ চলিয়াছিল। ফিকিরচাঁদের দলের লোকেরা

যেমন করিয়া গাইয়া দেশ মাতাইয়াছিলেন, তেমনই করিয়াই গাইলেন ; কিন্তু যখন গান প্রায় শেষ হইয়া আসিল, যখন গায়কদল "কেবল, তুমি আমার আমি তোমার কাঙ্গালের বেদ-গাথা" গান করিল, তখন বিজয়কৃষ্ণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না ; তিনি সেই পৌষ মাসের শীতের মধ্যেও গাত্রবস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কাঙ্গাল হরিনাথও তন্ময় হইয়া গেলেন ; তিনিও উঠিয়া দাঁড়াইলেম। তাহার পর শুধু "কেবল, তুমি আমার আমি তোমার" এইটুকু গান, আর নৃত্য। বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া বিজয়কৃষ্ণ ও কাঙ্গাল হরিনাথ ভাবাবেশে গাইতে ও নাচিতে লাগিলেন। কোথায় চলিয়া গেল আমার অবসাদ, কোথায় চলিয়া গেল আমার পথশ্রম ! এমন সুন্দর দৃশ্য, ভক্তের এমন ভাবোচ্ছ্বাস ত কখন দেখি নাই ; কখনও সে ভাবের ঢেউ আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিয়াছে কি না বলিতে পারি না।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এই ভাবে গান চলিতে লাগিল। তাহার পর ধীরে ধীরে সকলে প্রকৃতিস্থ হইলেন। সকলেই উপবেশন করিলেন। আমি মনে করিলাম, বোধ হয় আর গান হইবে না। কিন্তু তখনই আমার ভ্রম দূর হইল। কাঙ্গাল হরিনাথ গান করিয়া কখন ক্লান্ত, অবসন্ন হন নাই ; আমরা কোন দিন দেখি নাই যে, তিনি গাইতে গাইতে অবসন্ন হইয়াছেন। সমস্ত রাত্রি গান, একভাবে গান করিয়াছেন ! গান তাঁহার সাধনালব্ধ বস্তু ছিল। আমাদের বসিবার দুই তিন মিনিট পরেই কাঙ্গাল গুণগুণ করিয়া গান ধরিলেন ; ফিকিরচাঁদের দলের লোকেরাও কাঙ্গালের সঙ্গে থাকিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহারা তখনই তাঁহার সঙ্গে গান ধরিল—

"জাগ, জাগ ভাই পোহাল রজনী।
ও ভাই, আর কত কাল, ঘুমাইবে বল,
গাও মঙ্গল-আরতি, কর মঙ্গলধ্বনি। ( উঠ, উঠ রে ভাই )

১। সারা নিশি মায়ের কোলে ঘুমাইলে,
ঘুমের অলসে একবার মা ব'লে না ডাক্‌লে,
আপনি না জাগিলে, জেগে না কাঁদিলে,
ঘুমন্ত সন্তানে না জাগান জননী।
২। চৈতন্যের সন্তান হইয়া সকলে,
চিরদিন মায়ানিদ্রা-বশে-র'লে ;
ও ভাই, একবার দেখ জেগে, একবার দেখ ভেবে,
ওরে, মা আমাদের ব্রহ্ম-চৈতন্যরূপিনী। ( একবার জেগে দেখে )
৩। ঘুমের অলসে কত কথা বল,
ব্রহ্ম বলিতেই কেন আলস্য কেবল;
ওরে, সরল হ'য়ে ভাই, ব্রহ্ম বল সবাই,
ব্রহ্মনাম কেবল ভবের তরণী। ( ইহ পরকালে )।

এই গান শেষ হইতেই প্রাতঃকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পর আমরা যে চারিদিন ছিলাম, তাহার মধ্যে একদিন নগর সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। রাজসাহী ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা একদল সংকীর্ত্তন বাহির করিলেন এবং স্থানীয় হিন্দু ও ব্রাহ্মণগণের অনুরোধে কাঙ্গালের দলের লোকেরাও এক সংকীর্ত্তনের দল বাহির করা স্থির করিলেন!

সংকীর্ত্তনের দল বাহির করা স্থির হইল, কিন্তু কোন্ গান লইয়া বাহির হইতে হইবে তাহা আর স্থির হয় না। স্থির না হওয়ার কারণ এই যে আমাদিগের মত অস্থিরমতি যুবকগণের উপর তিনি গান স্থির করিবার ভার দিয়াছিলেন। আমরা গান স্থির করিতে বসিয়া পাড়া অস্থির করিয়া তুলিলাম। কিছুক্ষণ পরে কাঙ্গাল আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ওরে, তোদের গান স্থির হোয়েছে?" আমরা বলিলাম "স্থির হয় নাই, ও সব আমাদের কর্ম্ম নয়।" তিনি হাসিয়া বলিলেন "তোরা

কি চিরদিনই অকর্ম্মা থাক্‌বি। যাক্‌ তোদের কার কি মত শুনি।” তখন কেহ বলিলেন এটা, কেহ বলিলেন ওটা। তিনি মাথা নাড়িয়া বলিলেন “তোরা কিছুই বুঝ্‌তে পারিস্‌ না। দেখ্‌, এই যে বাতাস বহিয়া যায়, ইহা কি কেবল শরীর শীতল করে? বাতাস আরও একটা কাজ করিয়া থাকে। ইহা যেমন শরীর শীতল করে, সুগন্ধ বহিয়া আনে, তেমনই ইহা সমাচারও বহিয়া আনে। শুধু বাহিরের সমাচার নহে। তোমাদের বিজ্ঞান বাহিরের সমাচার বহনের সংবাদ রাখেন; কিন্তু এই বাতাস জীবের আধ্যাত্মিক সমাচারও বহন করিয়া আনে; লোকের খবরও আনিয়া দেয়। আর তাহা বেশ জানিতে পারা যায়। এই ধর, আমরা যে গান করি, তোমরা কি মনে কর গান করিবার সময় যা আমাদের মনে আসে তাই আমরা গাই। তাহা নহে; আমরা যেমন করিয়াই হউক সংবাদ পাই যে, যাঁহারা গান শুনিবার জন্য উপস্থিত আছেন তাঁহাদের হৃদয়ের মধ্যে কি ভাব উদ্দীপিত হইয়াছে। যাঁহারা তাহা বুঝিতে পারেন না, তাঁহারা যাহা তাহা গাইয়া বসেন, তাহাতে কোন্‌ ফল হয় না। এই সহরে যে সমস্ত লোক বাস করিতেছেন, অন্ততঃ যাঁহারা তোমাদের দলের গান শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের হৃদয়ের মধ্যে কি বাসনা জাগিয়াছে তাহা তোমরা বুঝিতে পার নাই; তাই এত গোলমাল করিতেছ। তোমরা ‘এই কি সেই আর্য্যস্থান আর্য্যসন্তান।’ এই গানটা একবার বেশ ভাল করিয়া গাইয়া লও। এই গান লইয়াই আজ তোমাদিগকে নগরে বাহির হইতে হইবে।”

গানের কথা শুনিয়া আমরা ত অবাক্‌। সকলে চুপ করিয়া রহিলেন দেখিয়া আমি বলিলাম “ও কি গান ঠিক করলেন। ব্রাহ্ম-সমাজের উৎসব উপলক্ষে সংকীর্ত্তন কর্‌তে হবে, আর আপনি বল্‌লেন কি না,

গাও 'আর্য্যস্থান আর্য্যসন্তান।' এ ত জাতীয়-সঙ্গীত ; এর সঙ্গে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের বা ধর্ম্মের সম্বন্ধ কি ? সংকীর্ত্তনে ভগবানের নাম গান করা সেই চৈতন্যের আমল থেকে চ'লে আস্‌ছে। সংকীর্ত্তন অর্থই নাম-সংকীর্ত্তন।"

কাঙ্গাল হাসিয়া বলিলেন "আগে তোমার কথারই জবাব দিই ; তার পর আমার কথা বল্‌ব। দেখ জ্বর থেকে উঠ্‌লে অনেক লোকেরই বড় অরুচি জন্মে ; ভাত, মাচ, ডাল, তরকারী কিছুই ভাল লাগে না, সবই বিস্বাদ বোধ হয়। তখন কি ক্রমাগত ভাত খাওয়াইয়া তাহাদের অরুচি দূর করা যায় ; সেই সকল রোগীর জন্য অন্য নানা রকম পথ্যের ব্যবস্থা করিতে হয়। সেই সকল পথ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে ভাতের উপর রুচি জন্মাইতে হয়। ভগবানের নামে রুচিও তেমনই করিয়া জন্মাইতে হয়। দেখ্‌চ না, দেশটা কেমন হ'য়ে গিয়েছে, সব রোগে জীর্ণ—ভবরোগে ভুগিয়া লোকের এখন আর নামে রুচি নাই। এখন যিনি সুবৈদ্য, তিনি কি আর শুধু নাম দিয়া এ অরুচি নিবারণ করিতে পারিবেন ? তা হবে না। শোন, ইহা বৈদ্যনাথের আদেশ! বৈদ্যনাথ বলিতেছেন যে, অন্য পথ্যের ব্যবস্থা প্রথমে কর, তারপর নামামৃত পান করাইও। আমরা বেশ বুঝিতে পার্‌ছি যে, দেশের লোকের মধ্যে দেশের কথা একটু সাড়া দিয়াছে। এখন দেশের কথার ভিতর দিয়া যাইতে হইবে। এ সকল রোগীর মুখে এখন দেশের অবস্থার চাট্‌নি দিতে হইবে ; তাতে রুচি জন্মাবে। তারপর ধীরে ধীরে দেশের কথা হইতে দশের কথা, তাহার পর দেশের যিনি কর্ত্তা তাঁহার কথায় লোকের রুচি জন্মিবে। আমি বলিতেছি, এই পথ—এই পথ! রাজসাহীতে এই পথ ধরিতে হইবে, এ সংবাদ আমি পাইয়াছি, এ কথা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। তাই ব্রাহ্মসমাজের সংকীর্ত্তনে ব্রহ্মনামের বদলে আর্য্যস্থানের আর্য্যসন্তানের কথা বলিতে চাই। আরও একটা কথা বলিয়া রাখি ; তোমরা দেখিতে

পাইবে, এই পথ দিয়ে গিয়ে পরে অনেক কাজ হবে। আমি তখন হয় ত বেঁচে থাক্‌ব না, কিন্তু তোমরা দেখতে পাবে, এই দেশের কথা হইতেই দেশের মালিকের কথা দেশময় প্রচারিত হবে।"

বহুদিন পূর্ব্বের কথা, তখন স্বদেশীর প্রচার হয় নাই, তখন কন্‌গ্রেসের জন্ম হয় নাই; সেই সময় কাঙ্গাল হরিনাথ কথাগুলি বলিয়াছিলেন, আর সে কথাগুলি আমি আমার ক্ষুদ্র একখানি নোটবুকে লিখিয়া রাখিয়াছিলাম; এমন অনেকের অনেক কথা আমার কাছে লেখা আছে। আজ এতদিন পরে সেই কথা বলিবার জন্যই কাঙ্গালের রাজসাহী গমনের কথা তুলিয়াছি। কাঙ্গালের ভবিষ্যৎদৃষ্টি, কাঙ্গালের অমানুষী প্রতিভা, কাঙ্গালের দূরদর্শন, এই কয়েকটী কথা হইতে কি বুঝিতে পারা যায় না? সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহার 'বন্দেমাতরম্' গান লিখিবার পর এই রকমের একটী কথাই বলিয়াছিলেন! কাঙ্গাল যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সার্থকতা সম্বন্ধে এখন কি কেহ সন্দেহ করিতে পারেন? লোকের কথার মধ্য দিয়া কি সকলে লোকনাথের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন না?

যথাসময়ে সংকীর্ত্তনের দল বাহির হইল। আমরা যে গান লইয়া বাহির হইয়াছিলাম সেইটির আগাগোড়া উদ্ধৃত করিতেছি। গানটি এই—

"এই কি সেই আর্য্যস্থান আর্য্যসন্তান?
ও যার তপোবলে যোগবলে কাঁপিত দেবতার প্রাণ।
ও যার হেরে বীর্য্যবল, স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল,
সভয়ে কাঁপিত গিরি সাগরের জল;
দিগ্‌দিগন্তরে, শূন্য ভরে, উড়িত বিজয়-নিশান।
২। যার শিল্প আর বিজ্ঞান, যোগতত্ত্ব, আত্মজ্ঞান,
করেছিল পৃথিবীর একদিন চক্ষু দান;
যার, বিদ্যাবলে আকাশতলে চ'লে যেত পুষ্পযান।

৩। যার যুদ্ধে যুদ্ধস্থল রক্তস্রোতে টলমল,
রক্তময় হ'ত যত নদনদীর জল ;
ব'সে বৃক্ষোপরে শূন্যভরে পাখী ক'রত রক্তপান।
৪। বিধির বিধান চমৎকার, এখন সেই আর্য্যকুমার
শৃগালের রব শুন্‌লে বাঁধে ঘরের দুয়ার ;
দেখ্‌লে রক্তজবা শুকায় জিহ্বা, চম্‌কে উঠে সবার প্রাণ।
৫। কাঙ্গাল বলে বিদ্যাবল, দেহবল, কলকৌশল,
ধর্ম্মবল বিনা রে ভাই, সকলই বিফল ;
সেই ধর্ম্ম বিনে দিনে দিনে, সকল হারায়ে শ্মশান। ( ভারত )

এই গান লইয়া আমরা রাজসাহী সহরে বাহির হইয়াছিলাম। তাহার পর যাহা হইয়াছিল তাহা অভাবনীয়, অচিন্তপূর্ব্ব! এখনও রাজসাহীর লোকেরা কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের ঐ গানের কথা, সে দিনের সেই বিপুল জনসঙ্ঘের কথা, সেই অতুল উন্মাদনার কথা, সেই ধরায় স্বর্গ নামিয়া আসিবার কথা বলিয়া থাকে। এই গান শুনিয়া সহরের লোক সে দিন সত্যসত্যই উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

গানের দল যখন ঘোড়ামারার বাজারে উপস্থিত হইল, তখন আর অগ্রসর হইবার উপায় রহিল না। বহু লোকে দলটীকে একেবারে ঘিরিয়া ধরিল। অবশেষে যে সমস্ত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক দলের সঙ্গে ছিলেন, তাঁহারা তখন গান বন্ধ করিয়া দিলেন, এবং সেই বাজারের মধ্যে বক্তৃতার আয়োজন করিলেন। শ্রীমান অক্ষয়কুমার বহুদিন হইতেই সুবক্তা সকলে তাঁহাকেই বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিলেন। অক্ষয় ত কিছুতেই বক্তৃতা করিতে চান না, এত লোকসমাগম দেখিয়া তিনি বিহ্বল (nervous) হইয়া গিয়াছিলেন। অনেক অনুরোধে তিনি একটা কেরোসিনের বাক্সের উপর দণ্ডায়মান হইলেন। আমি নীচে তাঁহার

পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলাম। আমি দেখিলাম অক্ষয়ের পা দুখানি থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। আমি বলিলাম "ভয় নাই, তুমি পড়িয়া যাইবে না, আমি তোমার পা চাপিয়া ধরিতেছি।" আমি তাহাই করিলাম। সুবক্তা অক্ষয়কুমার কোন প্রকারে দুদশ কথা বলিয়া নামিয়া পড়িলেন।

তখন কাঙ্গাল বলিলেন "জলধর, তুই কিছু বল্।" আমি বলিলাম "আমি পারিব না।" তিনি গর্জ্জন করিয়া বলিলেন "আমি বল্‌ছি, তুই বল।" আমার সাধ্য কি সে আদেশ লঙ্ঘন করি। আমি সেই আট দশ হাজার লোককে কি বলিয়াছিলাম তাহা আমি বলিতে পারি না। যাঁহার আদেশে কথা বলিয়াছিলাম, তিনি আমার মুখ দিয়া যাহা বলাইয়াছিলেন তাহাই বলিয়াছিলাম। আমার এ ধৃষ্টতা সে দিন সহরবাসী মহাশয়গণ মার্জ্জনা করিয়াছিলেন, পাঠকগণও আজ মার্জ্জনা করিবেন। ইহারই নাম 'ধাম ভানিতে শিবের গীত', কেহ বা বলিবেন "আপন কথাই পাঁচ কাহন।" কিন্তু উপায় নাই, জীবনের অনেক দিন কাঙ্গালের সুশীতল ছায়ায় কাটাইয়াছিলাম, তাই কাঙ্গালের কথা বলিতে গেলে নিজের হীন, অবজ্ঞাত জীবনের দুই একটী কথা আসিয়া পড়ে।

কথার পর কথা চলিতেছে, অথচ আমি কাঙ্গাল হরিনাথের কথা শেষ করিতে পারিতেছি না। এখন মনে হইতেছে, আমার জীবনের অবশিষ্ট কয়েকটা দিন যদি কাঙ্গালের কথাই বলি, তাহা হইলেও সে কথা বলা শেষ হইবে না। কাঙ্গালের জীবন-কথা আমি কয়েকটী ভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়াছি। তাঁহার বাল্যজীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছি; তাহার পরেই "বাঙ্গালাসাহিত্য হরিনাথ" বলা উচিত ছিল; তাহার পর "প্রজাবন্ধু হরিনাথ," তৎপরে "কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ হরিনাথ" সর্ব্বশেষে "ব্রহ্মাণ্ডবেদে হরিনাথ" বলিলে তবে হরিনাথের জীবন-কথার

ধারাবাহিকতা রক্ষা পাইত। কিন্তু আমি কাঙ্গাল হরিনাথের বাউল সংগীতের পরিচয় প্রদান করিবার জন্ত এমন ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, আমি ধারাবাহিকতা রক্ষা করিতে পারি নাই। আর বাউল সংগীতের বিবরণও ক্রমেই দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে; আমি কিছুতেই সে কথা সংক্ষেপ করিতে পারিতেছি না। ফিকিরচাঁদের কথাতেই সময় যাইতে বসিল; অন্ত কথা কবে বলিব? বলিবার অবকাশ হইবে কি? কাঙ্গাল হরিনাথের জীবনের প্রধান কথাগুলিই যে পড়িয়া রহিল। তাই আমার মনে হইতেছে আমার জীবনের বাকী কয়টা দিনেও হয় ত সব কথা বলা শেষ হইবে না।

তা না হউক, কিন্তু তাই বলিয়া আমি ফিকিরচাঁদের বাউল সঙ্গীতের কথা মধ্যপথে শেষ করিতে পারিতেছি না। আমি গানেরই পরিচয় প্রদান করিব। যে গানে আমাদের দেশে একটা ভাবের বন্যা ছুটিয়াছিল, যে গান শুনিয়া পূর্ব্ববঙ্গের নরনারী প্রাণে অতুল আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন, সে গানের সামান্ত পরিচয়ও যদি আমি দিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলেও কৃতার্থ হইব।

রাজসাহীতে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও কাঙ্গাল হরিনাথ যে আনন্দের হাট বসাইয়াছিলেন, তাহার কথা আমি বলিবার অবকাশ পাই নাই। আমরা সকলেই রাজসাহী ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রণ পাইয়া সেখানে গিয়াছিলাম, কিন্তু একদিন কি তুইদিন ব্যতীত আমরা ব্রাহ্মসমাজে যাইতে পারি নাই। যে দিন যাহা হইবে তাহার অনুষ্ঠানপত্র পুর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু রাজসাহীতে যাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলাম, দেখিলাম তাঁহারা ব্যবস্থার অতীত অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন— তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিবার অবস্থায় ছিলেন না। প্রাতঃকালে গোস্বামী মহাশয়ের ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করিবার কথা; এদিকে

তিনি শেষরাত্রিতেই শয্যাত্যাগ করিয়াছেন; আর তাঁহার শয্যাত্যাগের সাড়া পাইয়াই কাঙ্গাল হরিনাথ অমনি করতাল বাজাইয়া গান ধরিয়াছেন—

"মাগো রজনী প্রভাত হ'য়েছে।
ডাকিছে বিহঙ্গ, পবন-তরঙ্গ, গন্ধভরে মন্দ মন্দ যে বহিছে।
১। ভানু যত তনু প্রকাশ করিছে,
বিদায় দিতে তোমায় বিজয়া বলিছে;
বিদায় দিই কেমনে, ভেবে:সেই ভাব মনে,
আঁখি ঝুরে আমার হৃদয় ফাটিছে।
২। কাঙ্গাল বলে মাগো, সোজা বুঝ আমার,
আবাহন বিসর্জ্জন—নাই তোমার;
তুমি নিত্যনিরঞ্জনী, ভবভয়-ভঞ্জিনী,
নিত্য হৃদিপদ্মে জাগ, পূজি হৃদি মাঝে।"

কাঙ্গাল যদি গান শেষ করিলেন, তখন হয় ত আর একজন গান ধরিলেন—

"ভাইরে, রজনী প্রভাত হইল।
দেখ্‌রে নীরদ তনু, উদয় হ'ল ভানু,
বনে যাবি কি না কানু, আমায় সত্য বল।"

এই যে গানের উপর গান, ইহাতে কি আর সময় ঠিক থাকে। গোস্বামী মহাশয় ভাবে বিভোর হইয়া বসিয়া আছেন, কাঙ্গাল হরিনাথ যোগাসনে বসিয়া একমনে হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া গান করিতে-ছেন। রাত্রিশেষে গান আরম্ভ হইয়াছে, এদিকে বেলা আটটা নয়টা বাজিয়া যায়, গান শেষ হয় না; গোস্বামী মহাশয়ের সমাধি ভঙ্গ হয় না; কাঙ্গাল চক্ষু চাহিয়া দেখেন না। এ অবস্থায় ব্রাহ্মসমাজের ব্যবস্থা ঠিক

থাকিবে কি করিয়া, আর আমরাই বা এ আনন্দের হাট ছাড়িয়া ব্রাহ্ম-সমাজে যাইব কেমন করিয়া।

বেলা আটটা কি নয়টার সময় হয় ত তাঁহাদের হুঁস হইল। তখন চাহিয়া দেখেন বেলা হইয়া গিয়াছে; কাঙ্গাল হয় ত বলিলেন "তাই ত, সমাজে যাওয়া হইল না।" হইল না, ত হইল না। সুতরাং আমরা যে ছয় সাতদিন রাজসাহীতে ছিলাম, তাহার মধ্যে দুই একদিন ব্যতীত আমরা ব্রাহ্মসমাজে যাইতে পারি নাই। আমরা কিন্তু সেই সময়েই বলাবলি করিতাম যে, গোস্বামী মহাশয়ের যে প্রকার ভাব দেখিতেছি, তাহাতে তিনি আর অধিকদিন ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক উপাসনায় যোগদান করিতে পারিবেন না। আমাদের সে কথা ফলিতে বিলম্ব হয় নাই। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তাহার মাসাধিককাল পরেই গোস্বামী মহাশয়ের সহিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্বন্ধ লোপ হইয়াছিল। যদি পারি তবে সে কথা পরে বলিব, কারণ সে ঘটনার সহিত কাঙ্গাল হরিনাথেরও বিশেষ সম্বন্ধ আছে।

রাজসাহী অবস্থান সময়ে আমরা একদিন সহরের অদূরবর্ত্তী একটা গ্রামের ভগ্নাবশেষ দেখিতে গিয়াছিলাম। সে স্থানটা অতি ভয়ানক; দেখিলেই প্রাণে বিষাদের সঞ্চার হয়। বড় বড় দালান কোঠা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, চারিদিকে জনমানবের সম্পর্ক নাই, সমস্ত স্থানটা জঙ্গলে পরিপূর্ণ। বড় বড় পুষ্করিণী পড়িয়া রহিয়াছে, ঘাটগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, জল দেখিবার যো নাই, দামে দলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কোম্পানীর আমলে একজন ব্যবসায়ী কারবার করিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন; তিনিই এই গ্রাম বসাইয়াছিলেন, এই সকল প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, এই সকল জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন। তাহার পর?—তাহার পর এখন পুরাতন ইষ্টকস্তূপ, ভগ্ন দেওয়াল, পরিত্যক্ত

জলাশয় অতীত ধনসম্পদের নশ্বরতা দেখাইবার জন্য সেই জঙ্গলের মধ্যে পড়িয়া আছে।

আমরা সেই জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া যে যে দিকে পারিলাম চলিয়া গেলাম। কাঙ্গাল ও গোস্বামী মহাশয় একদিকে গেলেন। একটু পরেই কাঙ্গালের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। তখন আমরা যে যেখানে ছিলাম, সেই কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলাম। আমরা তাঁহাদের নিকটে যাইয়া দেখি, তাঁহারা তাঁহাদের উপযুক্ত স্থানই নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছেন। স্থানটীর চিত্র এখনও আমি আমার চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি। একটী জঙ্গলাকীর্ণ পুষ্করিণীর দক্ষিণ পারে একটী অনতিবৃহৎ মন্দির; মন্দিরটী ভগ্ন হয় নাই; কিন্তু মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। আশে পাশে বড় বড় গাছসকল মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। স্থানটি দেখিলে সত্য সত্যই হৃদয়ে পবিত্রভাবের উদয় হয়। সেই মন্দিরের সোপানে বসিয়া আছেন দুই সাধুপুরুষ—বিজয়কৃষ্ণ ও কাঙ্গাল হরিনাথ। সে যে কি অপূর্ব্ব ছবি তাহা আমি বলিতে পারিব না। বিজয়কৃষ্ণ যোগাসনে উপবিষ্ট, আর তাঁহার পার্শ্বে গৈরিক-পরিহিত, শ্বেতশ্মশ্রুমণ্ডিত, বিশাল-বক্ষ, গৌরকান্তি কাঙ্গাল হরিনাথ মুদিতনেত্রে বসিয়া গান ধরিয়াছেন—

"বাসাবাড়ী পাকা করা কি ঝকমারি।
কর্ম্ম গেলে দু'দিন রইতে নারি।

১। জীবের দেহ কাঁচা বাসা, ক্ষণ নাহি ভরসা,
তবু পাকা করে আশা করি;
কালের স্রোতে দিলে টান পাকা কাঁচা সমান,
যখন উঠে মৃত্যু-তুফান ভারি।

২। গাঁথি' ইট পাতরে পোস্ত, পাকা বন্দোবস্ত,
করলে যে সমস্ত কোঠাবাড়ী;

কালের ভূমিকম্প এসে, সকল প'ড়ল খ'সে,
এখন থাকবি কিসে দেখ বিচারি'।

৩। জীবের বাড়ী ঘর আছে, ভেবে কি দেখিছে,
গোলক মাঝে নিত্যানন্দ পুরী ;
যদি যাবি সেই বাড়ীতে, হবে রে ছাড়িতে,
বিষয়-বাসনা মায়া-নারী।

৪। আমি কাঙ্গাল এমনি বোকা, কাঁচা করি পাকা,
এখন তাতে দেখি বিপদ ভারি ;
কোথায় হরি দয়াময়, এ বিপদ সময়,
দয়া করি দাও হে চরণ-তরি।"

এই গান যখন শেষ হইয়া গেল, তখন অপরাহ্ণ পাঁচটা বাজিয়াছে। পৌষ মাসে পাঁচটার সময়েই প্রায় সন্ধ্যা হয়। আমাদের একজন সঙ্গী বলিলেন যে, জঙ্গলে বাঘ শূকর প্রভৃতি থাকিতে পারে ; অতএব এখনই এই জঙ্গল হইতে বাহির হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু এ কর্ত্তব্যের কথা কাঙ্গাল বা গোস্বামী মহাশয়ের কর্ণে প্রবেশ করিল না। কাঙ্গাল আমাদিগের দিকে চাহিয়া বলিলেন "এমন পবিত্র স্থান আর পাবি না ; এখানে তোরা সকলে মিলে একটা গান গা।" এ আদেশ অমান্য করিবার শক্তি কাহারও ছিল না। নগেন্দ্রভায়া গান ধরিলেন—

"ভেবে ত দেখে না কেউ, কত যে ঢেউ
উঠ্‌ছে সদা দেল্ দরিয়ায়।

১। কখন হ'য়ে রাজা, মারে মজা,
মনেতে মন মনকলা খায় ;
কখন পাদ্‌সা উজীর, কোটাল নাজীর,
আবার ফকির হ'য়ে বেড়ায়।

২। কখন ধনের জাঙ্গাল, কখন কাঙ্গাল,
অট্টালিকা বৃক্ষতলায় ;
ওরে, তোর মনের মাঝে হাসিকান্না,
ঘরকন্না এই সমুদায়।

৩। ওরে ভাই মনের কথা যেথা সেথা,
ব'ল্লে আবার লোকে ক্ষেপায় ;
এ পাগল কে নয় রে ভাই, মনের কথা
ব'ল্লে সবাই, তা জানা যায়।

৪। কাঙ্গাল কয়, যে জন মোরে পাগল ক'রে,
মনের কবাট ভেঙ্গে ফেলায় ;
যদি সেই পাগল-করা পড়ে ধরা,
তবে সফল পাগল হওয়ায়।"

আমরা সকলে মিলিয়া এই গানটী গাইতে লাগিলাম। বিজয়কৃষ্ণ ও কাঙ্গাল স্থিরভাবে বসিয়া গান শুনিতে লাগিলেন। শেষে যখন আমরা গাইলাম—

"যদি সেই পাগল-করা পড়ে ধরা,
তবেই সফল পাগল হওয়ায়।"

তখন পরম ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি তখন ভাবাবেশে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন, মন্দিরের সিঁড়ি হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন ; তাঁহার গাত্রবস্ত্র কোথায় পড়িয়া রহিল, পরিধেয় বস্ত্র ঠিক থাকিল না। সেই শীতের মধ্যে সন্ধ্যার সময় দিগম্বরবেশে সাধকপ্রবর শুধুই বলিতে লাগিলেন—

"যদি সেই পাগল-করা পড়ে ধরা।"

আমরাও গানের আর সমস্ত কথা ছাড়িয়া দিয়া গাইতে লাগিলাম—

"যদি সেই পাগল-করা পড়ে ধরা।"—

হতভাগ্য আমরা,—আমরা শুধু গানই করিলাম ; আর ঐ যে দুইটী পাগল, উঁহারা সেই "পাগলকরা"কে "ধরিয়া" আনন্দে বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, চারিদিক অন্ধকারে ডুবিয়া গেল, পুষ্করিণীর জল কালো হইয়া গেল, আকাশে নক্ষত্র উঠিল, কিন্তু সেই "পাগলকরা" তাঁহার দুইটী পাগলকে ছাড়িলেন না ; আমরা এদিকে গোলে হরিবোল দিতে দিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম ; সেই "পাগল-করা" আমাদের দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না।

এইবার আমরা রাজসাহী ত্যাগ করিব। ব্রাহ্মসমাজের উৎসব শেষ হইল, রাজসাহীর উৎসব-আনন্দ মিটিয়া গেল ; এখন আমাদের বিদায় গ্রহণের পালা। কাঙ্গাল হরিনাথের অনুরোধে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের রাজসাহী হইতে বরাবর কাঙ্গালের কুটীরে যাইবার কথা হইল। গোস্বামী মহাশয় তাহাতে বলিলেন যে, তিনি কুমারখালি হইতে মাঘোৎসবে যোগ দিবার জন্য যখন কলিকাতায় যাইবেন তখন কাঙ্গালকে সদলবলে তাঁহার সঙ্গে কলিকাতায় যাইতে হইবে। কাঙ্গাল প্রথমে একটু আপত্তি করিয়াছিলেন ; তিনি বলিয়াছিলেন কলিকাতায় কি ফকিরদের স্থান হইবে ; সেখানে কি কেহ ফিকিরচাঁদের গান শুনিবে, সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে কি বাউলের গান হইতে পারিবে ? তিনি হয় ত মনে করিয়াছিলেন, কলিকাতার ন্যায় স্থানে কেহ বাউলের গান শুনিবে না ; সুতরাং তাঁহারা সেখানে যাইয়া কি করিবেন ? গোস্বামী মহাশয় এ আপত্তি শুনিলেন না ; তিনি বিশেষভাবে অনুরোধ করায় কাঙ্গাল হরিনাথ বহুকাল পরে কলিকাতায় গমন করিতে সম্মত হইলেন ; কিন্তু তিনি বলিলেন "কলিকাতায় কাঙ্গালের স্থান নাই, সে যে বড়মানুষের সহর। তাই আমি বহুকাল কলিকাতায় যাই নাই।"

সে যাহাই হউক, আমাদের নৌকাপথে দামুককিয়া ঘাট পর্য্যন্ত যাওয়া স্থির হইল এবং সেখান হইতে রেলে কুমারখালি যাইতে হইবে। শ্রীমান অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের পিতৃদেব মথুর বাবু বলিলেন "যদি দামুকদিয়া পর্য্যন্ত নৌকায়ই গেলেন, তাহা হইলে একেবারে সেই নৌকায় কুমারখালি গেলেই হয়; রেলের হাঙ্গামায় প্রয়োজন কি?" শেষে তাহাই স্থির হইল।

পরদিন অতি প্রত্যুষে আমরা যাত্রা করিলাম। গোস্বামী মহাশয়, তাঁহার সহধর্ম্মিণী, তাঁহার দুই কন্যা ও তাঁহার শাশুড়ী ঠাকুরাণী, কাঙ্গা-লের দল এবং আমি নৌকায় উঠিলাম। নৌকা ছাড়িয়া দিবার অব্যবহিত পরেই গোস্বামী মহাশয় বলিলেন "আজ আর আহারাদির হাঙ্গামা করা হইবে না, নৌকায় যা জলখাবার লওয়া হইয়াছে তাহাতেই আজ ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে হইবে। কুমারখালিতে পোঁছিয়া আজ অন্ন গ্রহণ। নৌকায় অবিশ্রান্ত গান চলিবে।" ভাল কথা।

তখনই গানের আয়োজন হইল। কাঙ্গাল আর আমাদের উপর গান নির্ব্বাচনের ভার দিলেন না, তিনি নিজেই গান ধরিলেন—

বচ্ছে ভবনদীর নিরবধি খরধার।
দেখ, ক্ষণকাল বিরাম নাই এই দরিয়ার।

১। ডিঙ্গা ডিঙ্গী পিনেস বজরা মহাজনী নৌকায়,
পাপী তাপী সাধু ভক্ত চড়নদার তার সমুদায়;
ভাসিছে দরিয়ার জলে, ইচ্ছামত নৌকা চলে,
হা'ল ধ'রে তার সুকৌশলে ব'সে আছে কর্ণধার।
(মন সবার)

২। কর্ণধারের ইচ্ছামত কেহ চলে উজায়ে,
মনের সুখে জ্ঞান-মাস্তলে ভক্তিপাল উড়ায়ে;

কেহ আবার মনের দোষে, ভেটেনেতে যাচ্ছে ভেসে,
পাকে ফেলে অবশেষে ডুবায় তরি কর্ণধার।
( মন সবার )

২। কেহ আবার ক্রমাগত বলে বলে ভাটিয়ে,
অপার সাগরে পড়ে নদীর মুখ ছাড়িয়ে ;
সাগরে তরঙ্গ ভারি, স্থির নাহি থাকে তরি,
লোণা জলে জীর্ণ করি ডুবায় তরি কর্ণধার।
( মন সবার )

৪। সাধু মহাজন যত বাদাম তুলে দরিয়ায়,
সুবাতাসে চলে তারা, মুখে নামের সারি গায় ;
ঠিক না থাকিলে হালি, অমনি নৌকা করে গালি,
গুপ্তচড়ায় চোরাবালি, ডুবায় তরি কর্ণধার।
( মন সবার )

৫। কাঙ্গাল বলে, কাঙ্গালের পুঁজিপাটা যা ছিল,
বারে বারে ডুবে ভবে সকলই ত খোয়াল ;
খাবি-খেয়ে অনেক কাল, আবার তুলে দিলাম পাল,
(এবার ) সাবধানে ধর হা'ল বিনয় করি কর্ণধার।
( মন আমার )

প্রাতঃকাল পদ্মানদীর বালুকাময় তীরের নিকট দিয়া ভাটীস্রোতে নৌকা চলিতেছে, দাঁড়িরা গানের সঙ্গে সঙ্গে তাল দিয়া দাঁড় ফেলিতেছে, পশ্চাতে কর্ণধার হা'ল ধরিয়া বসিয়া আছে। নৌকার মধ্যে সাধকপ্রবর হরিনাথ সুর সপ্তমে চড়াইয়া বলিতেছেন—

"সাবধানে ধর হা'ল বিনয় করি কর্ণধার।"

আমার ত মনে হইল আজ সত্যসত্যই ভবনদীর কর্ণধার সাবধানে হাল

ধরিয়া বসিয়াছেন, আর আমরা সাধু মহাজনের সঙ্গে ভব পারে যাইতেছি। ভবপারে যাইবার এমন সাধুসঙ্গ কি আমাদের মিলিবে ?

কাঙ্গালের গান শেষ হইলে স্বয়ং গোস্বামী মহাশয় বলিলেন "তোমরা নদীর গানটি গাও।" তখন আবার গান আরম্ভ হইল। এবারও কাঙ্গাল গান ধরিলেন—

নদী বল্‌রে বল্‌ আমায় বল রে।
কে তোরে ঢালিয়ে দিল এমন শীতল জল রে।

১। পাষাণে জন্ম নিলে, ধরলে নাম হিমশিলে,
কার প্রেমে গ'লে আবার হইলে তরল রে ;
(ওরে) যে নামেতে তুমি গল, সেই নাম একবার আমায় বল,
দেখি গলে কি না আমার কঠিন হৃদিস্থল রে।

২। কার ভাবে ধীরে ধীরে, গান কর গভীর স্বরে,
প্রাণ মন হরে কিবা শব্দ কল কল রে ;
নদী রে তোর ভাবাবেশে, যখন যায় রে বক্ষঃস্থল ভেসে
তখনই বর্ষা এসে ভাসায় ধরাতল রে।

৩। ভক্তজন পবন সঙ্গে, পুলক না ধরে অঙ্গে,
প্রেমতরঙ্গে তুমি কর টলমল রে ;
তুমি নেচে নেচে ছুটে বেড়াও, যারে নিকটে পাও তারে নাচাও,
উচ্চরবে কার নাম গাও হইয়ে বিকল রে।

৪। সর্ব্বত্র সমান স্বভাব, কোথাও নাই গুণের অভাব,
মরি রে তোমার প্রভাব শক্তি কি অটল রে ;
(তুমি) ঘৃণা ক'রে না দেও ফেলে, যত সড়া মরা কর কোলে,
করলে পরশ তোমার জলে অঙ্গ হয় শীতল রে।

৫। যে সৃজন করে তোরে, তার স্বরূপ তোমার নীরে,
তাই নদী তোমার তীরে দেখি শ্মশানস্থল রে ;
যোগী ঋষি আদর ক'রে, তাই তোমার তটে সাধন করে,
হ'য়ে থাকে তোমায় হেরে হৃদয় নিরমল রে।

৬। মূঢ় মন যত নরে, কিছু না বিচার করে,
তব জলে ত্যাগ করে মূত্র আর মল রে ;
তাতেও তোমার না যায় গৌরব, তুমি মায়ের মত সংবর সব,
কাঙ্গালের ভব-বান্ধব শ্মশান-গঙ্গাজল রে।

ফিকিরচাঁদের অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে এই প্রকারে গানের পর গান বাহির হইতে লাগিল, আর আমরা ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া সেই স্বর্গের অমৃত পান করিতে লাগিলাম। কোন্ দিক দিয়া বেলা হইল, সূর্য্য মাথার উপর উঠিল, তাহা আমরা জানিতেও পারিলাম না। বেলা দুইটার সময় একটী শ্মশানের পার্শ্বে মাঝিরা নৌকা লাগাইল। তখন আমরা সকলেই নৌকা হইতে নামিলাম। নিকটেই শ্মশান দেখিয়া কাঙ্গাল আমাদিগকে লইয়া সেই দিকে গেলেন। বোধ হয় পূর্ব্বদিনই সেই স্থানে একটী শবদাহ হইয়াছিল। যাহারা মৃতদেহ দাহ করিতে আসিয়াছিল, তাহারা বোধ হয় যথেষ্ট কাষ্ঠ লইয়া আসে নাই। মৃতদেহটী অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায়ই জলের পার্শ্বে পড়িয়া ছিল। শরীরে মাংস নাই, তবে হাড়গুলি অধিকাংশই যথাবিন্যস্ত অবস্থায় ছিল। এই মৃতদেহ দেখিয়া কাঙ্গাল গান ধরিলেন—

ভাই রে, কে তুমি এই শ্মশান-শয্যায়।
সন্ন্যাসীর বেশে, হায় শেষে কে তোমায় দিল বিদায়।

১। ভাইরে, যদি হও মুল্লুকের বাদসা,
তবে, কে করিল এ হেন দশা ;

তোমার সৈন্যবল, কল কৌশল,
সে সকল এখন কোথায়

২। ভাইরে, তোমার সেই অতুল ধনরাশি,
এখন, কারে দিয়ে সাজ্‌লে সন্ন্যাসী ;
তোমার কই বাড়ী, সে জুড়ি
গাড়ী এখন কে হাঁকায়।

৩। ভাইরে, যদি হও তুমি মান্যমান,
কুল-মর্য্যাদায় সব কুলীন-প্রধান ;
তোমার সে মান্য, কৌলীন্য,
প্রাধান্য এখন কোথায়।

৪। ভাইরে যদি হও দীনহীন কাঙ্গাল,
তবে ধনীর দ্বারে যত খেয়ে গা'ল,
ভিক্ষা ক'রেছ, কেঁদেছ,
এখন সে জ্বালা নিবায়।

৫। কাঙ্গাল বলিছে, কাঙ্গাল ধনবান,
শুলে শ্মশানে হয় সকলে সমান ;
জাতি কুল বিচার, অহঙ্কার,
কোন বিচার নাই হেথায়।

সেই শ্মশান-ভূমিতে দাঁড়াইয়া আরও দুই তিনটা গান হইল। সকল গানের কথা এখন মনেও পড়িতেছে না। শেষে মাঝিরা তাড়াতাড়ি করায় সকলে নৌকায় উঠিলেন। আবার নৌকা ছাড়িয়া দিল।

শীতকাল, পাঁচটার সময়ই সূর্য্য অস্ত যাইবার আয়োজন করিল। আমরা যখন পদ্মা-নদী ছাড়িয়া গোরাই নদীতে প্রবেশ করিলাম তখন সন্ধ্যা হয় হয়। সেই সময়ে কাঙ্গালের আদেশে ফিকিরচাঁদের দলের

লোকেরা যে গানটী গাহিয়াছিলেন তাহা এখনও আমার মনে আছে, এবং যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, সে গানের কথা, সেই সময়ের কথা, আর পূজনীয় গোস্বামী মহাশয় ও কাঙ্গাল হরিনাথের অপূর্ব্ব ভাবাবেশের কথা আমার মনে থাকিবে। ফিকিরচাঁদের দল গান ধরিল—

ওরে, দিন ত গেল, সন্ধ্যা হ'ল, পার কর আমারে।
তুমি, পারের কর্ত্তা, শুনে বার্ত্তা ডাক্‌ছি হে তোমারে।

১। আমি আগে এসে, ঘাটে রইলাম ব'সে,
যারা পাছে এল, আগে গেল, আমিই রইলাম প'ড়ে।

২। যাদের পথের সম্বল, আছে সাধনার বল,
তারা নিজ বলে, গেল চ'লে অকূল পারাবারে।

৩। শুনি, কড়ি নাই যার, তুমি কর তারেও পার,
আমি দীন-ভিখারী, নাইক কড়ি, দেখ ঝুলি ঝেড়ে।

৪। আমার পারের সম্বল, দয়াল নামটী কেবল,
ফিকির কেঁদে আকুল, প'ড়ে অকূল সাঁতারে পাথারে।

গানটী বড়ই সময়োপযোগী হইয়াছিল, তাই গোস্বামী মহাশয় ও কাঙ্গাল হরিনাথ এত ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন। আমরা যে ঘোর পাষণ্ড, আমাদের প্রাণেও তখন একটা অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল।

রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটার সময় আমাদের নৌকা আসিয়া কুমারখালির ঘাটে লাগিল। আমরা নৌকা হইতে নামিলাম। তখন আমরাই পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম যে, একটা গান করিতে করিতে আমরা সদলবলে কাঙ্গালের কুটীরে উপস্থিত হইব। তাহার পর কথা উঠিল, কি গান করা যায়? আমি বলিলাম, "সে ভার আমার উপর। আমি যে গান ধরিব তোমরা আমার সঙ্গে সেই গানই গাহিও।" তাহাই স্থির হইল।

নদীতীর হইতে আমাদের গ্রামে যাইতে হইলে খানিকটা বালুকাপূর্ণ চর অতিক্রম করিতে হয়। আমরা সেই চরের উপর দিয়া নিঃশব্দে চলিতে লাগিলাম। চর পার হইয়া যখন আমরা গ্রামের :মধ্যে প্রবেশ করিলাম, তখন আমি সকলকে বলিলাম, এই সময়ে গান ধরিতে হইবে। ফিকির-চাঁদের দলের লোকেরা সকলেই এক একখানি খঞ্জনী হাতে লইয়া প্রস্তুত ছিলেন। আমি গান ধরিলাম—

যাদের হরি ব'ল্‌তে নয়ন ঝুরে,
(ওরে) তারা দুভাই এসেছে রে।"

সেই গভীর রাত্রিতে সুপ্তিমগ্ন পল্লীর নীরব নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া আট দশখানি খঞ্জনী বাজিয়া উঠিল, আর ফিকিরের দলের সুগায়কগণ কণ্ঠ সপ্তমে চড়াইয়া গান ধরিল—

যাদের হরি বল্‌তে নয়ন ঝুরে,
(ওরে) তারা দুভাই এসেছে রে।
যারা. আচণ্ডালে প্রেম বিলায়, এসেছে।
যারা, নাচে আর হরি বলে, এসেছে রে।
যারা মার খেয়ে হরি বলে, এসেছে রে। ইত্যাদি

তখন আর কথার অভাব হইল না, ভাবের অভাব হইল না। আট দশখানি খঞ্জনী বাজিতেছে, সুগায়কগণ ভাবে বিভোর হইয়া গান করিতেছেন ; গ্রামের লোক কি আর শয়ন করিয়া থাকিতে পারে ? যে যে অবস্থায় ছিল, সে সেই অবস্থাতেই রাস্তায় বাহির হইল। দেখিতে দেখিতে সমস্ত গ্রামখানি জাগিয়া উঠিল। আর গান করিবার লোকের অভাব হইল না ; সকলেই আসিয়া আমাদের এই মহাসংকীর্ত্তনে যোগদান করিতে লাগিল। আর গোস্বামী মহাশয় ও কাঙ্গাল হরিনাথ—তাঁহাদের কথা কি বলিব ! তাঁহারা উন্মত্তপ্রায় হইলেন। তাঁহারা দুইজনে আমাদের

এই জনসঙ্ঘের সম্মুখভাগে দুই বাহু তুলিয়া ভাবে বিভোর হইয়া গান করিতে করিতে চলিলেন—

"তারা দুভাই এসেছে রে।"

সত্যসত্যই সে সময়ে যাঁহারা এ দৃশ্য দেখিয়াছিলেন তাঁহাদেরই মনে হইয়াছিল, ঐ ত দুভাই এসেছেন—ঐ ত উঁহাদেরই "হরি ব'ল্‌তে নয়ন ঝুরে।" আমরা সত্যসত্যই 'যাদের হরি বল্‌তে নয়ন ঝুরে' সেই 'দুভাই'কে লইয়াই গ্রামে প্রবেশ করিয়াছিলাম; যারা "নাচে আর হরি বলে" তাদের লইয়াই গ্রামে আসিয়াছিলাম।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট কাঙ্গাল হরিনাথ প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, তিনি ১১ই মাঘের ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় গমন করিবেন। গোস্বামী মহাশয় কুমারখালিতে কয়েকদিন অপেক্ষা করিয়াই সপরিবারে কলিকাতায় চলিয়া গেলেন; কাঙ্গাল তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে পারিলেন না। ১১ই মাঘের বিলম্ব ছিল সেই জন্য তিনি কয়েকদিন বাড়ীতেই থাকিলেন।

আমার ঠিক মনে পড়িতেছে না, বোধ হয় ৯ই মাঘ রাত্রির গাড়ীতে ফিকিরচাঁদের দলের কয়েকটী লোক সঙ্গে লইয়া কাঙ্গাল কলিকাতা গমন করেন, আমিও সেই দলে ছিলাম। ইহা ১২৯১ সালের কথা।

আমরা কলিকাতায় পৌঁছিয়া পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের বাসস্থানেই উঠিয়াছিলাম। শ্রীমান অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তখন কলিকাতায় ছিলেন; তিনি ষ্টেসন হইতে আমাদিগের সঙ্গী হইলেন। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পার্শ্বের গলির মধ্যে একটা বাড়ীতে তখন থাকিতেন। তখন তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ছিলেন, সেই জন্য প্রচারকগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট গৃহে তিনি বাস করিতেন। আমরা

কাঙ্গালের দলকে গোস্বামী মহাশয়ের বাসায় পৌঁছাইয়া দিয়া, সেখান হইতে স্থানান্তরে চলিয়া গেলাম।

পরদিন ১০ই মাঘ প্রাতঃকালে আমরা গোস্বামী মহাশয়ের বাসায় যাইয়া দেখি, সেখানে অনেক লোক সমবেত হইয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের সে দিনের প্রাতঃকালের উপাসনায় যে সমস্ত লোক সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই গোস্বামী মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, কারণ সকলেই শুনিতে পাইয়াছিলেন যে, কাঙ্গাল হরিনাথ তাঁহার বাউলের দলের কয়েকটী লোক সঙ্গে লইয়া সেখানে আছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে কাঙ্গালের গান হইবার সম্ভাবনা ছিল না, তাহা আমরাও জানিতাম, কাঙ্গালও জানিতেন। কাঙ্গালের গান কেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পবিত্র-মন্দিরে হইতে পারিবে না, তাহার কারণ বলিতে পারি না। সে যাহাই হউক, সমাজ-মন্দিরের প্রাতঃকালের উপাসনা শেষ হইলে অনেক ব্রাহ্ম ও অন্যান্য ভদ্রলোক গোস্বামী মহাশয়ের বাসভবনে উপস্থিত হইলেন, এবং সকলেই কাঙ্গালের গান শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন গান আরম্ভ হইল। সে সময়ে যে কয়েকটী গান হইয়াছিল, তাহার সবগুলির কথা আমার স্মরণ হয় না, কেবল একটী গানের কথা আমার মনে আছে। তাহা এই—

ব্রহ্মধন কি পদার্থ, তাহার অর্থ
যে বুঝে নাই, সেই বুঝেছে।

১। বলে রে যে সব জ্ঞানী, ব্রহ্ম জানি,
জানে না সে, বলে মিছে;
যে বলে জানিনে রে জানি তাঁরে,
সেই যে তাঁর কিছু জেনেছে।

২। এই যে ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড, কত কাণ্ড
অবিশ্রান্ত ঘুরিতেছে ;
এই সকল ভাণ্ডের মাঝে ব্রহ্ম আছে,
কেহ তাঁরে না দেখেছে।
৩। মানব জ্ঞান বেদ বেদান্ত, না পায় অন্ত
মন বুদ্ধি হার মেনেছে ;
কাঙ্গাল কয় ব্রহ্ম যারে, দয়া করে,
ব্রহ্ম কেবল সেই জেনেছে।

এই গানের পর আরও অনেক গান হইয়াছিল। বেলা প্রায় দুইটা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত গান চলিয়াছিল ; যত লোক গান শুনিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহই এত বেলা পর্য্যন্ত সে স্থান ত্যাগ করিতে পারেন নাই। আমাদেরও সে দিন বাসায় যাওয়া হইল না ; সাধুসঙ্গেই দিন কাটিয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় ব্রাহ্মসমাজে যথারীতি উপাসনা হইল। তাহার পর আমরা বাসায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলে গোস্বামী মহাশয় ও কাঙ্গাল হরিনাথ উভয়েই আমাদিগকে ( অক্ষয়কে ও আমাকে ) সে রাত্রি সেখানেই অতিবাহিত করিবার আদেশ করিলেন। আমরা আহারাদি শেষ করিয়া বিশ্রামের আয়োজন করিতেছি, এমন সময় কাঙ্গাল বলিলেন "তোদের কি ঘুমাইবার জন্য রাখিয়াছি ; আজ সমস্ত রাত্রি তোরা উৎসব করবি,তাহারই জন্য তোদের বাসায় যাইতে দিই নাই।" আমরা বুঝিলাম সমস্ত রাত্রি এ বাড়ীতে নিদ্রা-দেবীর আগমনের কোন সম্ভাবনা নাই। তখন গানের আয়োজন হইল। একটী গান সেই দিনই বাঁধা হইয়াছিল ; সেইটীই প্রথমে গীত হইল। গানটী এই :—

সহেনা যাতনা আর, মা আমায় বাঁচাও বাঁচাও।

১। অসত্য এই দেহদুর্গে, আমি রয়েছি অসৎ সংসর্গে মা ;—
ত্রাণ নাই কোন রূপে, দয়া ক'রে সৎস্বরূপে লইয়া যাও।
(অসৎ হ'তে)

২। অসৎ দুর্গে ঘোর অন্ধকার, আমি, আপনি দেখিনে আপনার মা;—
দেখব কি আর তোমায়. ও মা আমায় জ্যোতিতে আজ লইয়া যাও।
( এই আঁধার হ'তে )

৩। স্বাধীনতা না আছে যার, ওগো সেই ত মৃত সন্তান তোমার মা ;—
রিপুর অনুগত, আমি মৃত, অমৃতেতে লইয়া যাও।
( এই মৃত্যু হ'তে )

৪। জন্মাবধি অপরাধী, রুদ্রমুখ তাই নিরবধি মা ;—
কাঙ্গাল সদা দেখে, মা আমাকে প্রসন্ন মুখ দেখাও দেখাও।
( তোমার শান্তিমাখা )

ব্রাহ্মসমাজে যে প্রার্থনা হইয়া থাকে "অসতো মা সদ্গময়—অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও ইত্যাদি" উপরিলিখিত গানটি তাহাই। তবে একটু পার্থক্য আছে। উক্ত শ্লোক বা তাহার বাঙ্গালা অনুবাদে সেই পরম পুরুষের নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে, আর কাঙ্গাল—মাতৃভক্ত কাঙ্গাল মায়ের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।

উপরিউক্ত গানটি বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। গোস্বামী মহাশয় এই গান শুনিয়া এমন বিহ্বল হইয়াছিলেন যে, তিনি আর বসিয়া থাকিতে পারেন নাই, দণ্ডায়মান হইয়া "মা মা" বলিয়া চীৎকার করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন।

তাহার পর গান হইল———

আয় রে মন আমার সাথে, বৈদ্যনাথে,
হবে রোগের প্রতিকার।

১। তিনি যে অনাথের নাথ, হন বৈদ্যনাথ,
কাঙ্গালে তাঁর দয়া বড় ;
তাঁর দ্বারে ধরণা দিলে, তাঁয় ডাকিলে,
কোন রোগ না থাকে কার।

২। তিনি হন বড় দয়াল, ধনী কাঙ্গাল,
সকলই যে সমান তাঁর ;
তাঁরে ভাই সকাতরে ডাক্‌লে পরে,
দয়া করেন যার তার।

৩। কাঙ্গাল কয় সে বৈদ্যনাথ, অনাথের নাথ,
টাকা কড়ি লন্ না কার ;
কেবল রে ভক্তি ক'রে ডাক্‌লে পরে
রোগ হ'তে করেন উদ্ধার।

তাহার পর আরও গান হইল; সে সকল এখন আমার স্মরণ হইতেছে না। সমস্ত রাত্রি এই ভাবে গান চলিল।

এ দিকে রাত্রি শেষ হইতে না হইতেই দলে দলে লোক ব্রাহ্মসমাজে আসিতে লাগিলেন। ১১ই মাঘের প্রাতঃকালে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সমাজ-মন্দিরে উপাসনা করিবেন শুনিয়া অনেকেই রাত্রি থাকিতেই মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখনও অন্ধকার আছে, তখনও কলিকাতার রাজপথের আলো নির্ব্বাপিত হয় নাই। সেই সময়েই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে খোল করতাল বাজিয়া উঠিল। সেই শব্দ পাইয়াই কাঙ্গালের দল গোস্বামী মহাশয়ের বাসভবনে গান ধরিলেন—

একবার জাগো জাগো রে, দেখ না চাহিয়ে।
ঐ যে বনের পাখীগণ হইয়ে চেতন, মায়ের নাম স্মরি গেল রে চলিয়ে।

১। আশা করি বৃক্ষে বাসা বাঁধিয়াছ,
চিরদিন ভবে রবে ভাবিয়াছ ;
ঐ দেখ্, হ'ল প্রাতঃকাল, এল ব্যাধ কাল,
কেন অকালে এ জীবন হারাও ঘুমাইয়ে।

২। মানস বিহঙ্গ কত ঘুমাইবি
দয়াময় বল মোক্ষ ফল পাবি,
দয়াময়ের নাম, লও রে আত্মারাম,
তোর শমন-ভয় যাবে সহজে চলিয়ে।

এই গান শেষ হইলেই সকলে গাত্রোত্থান করিলেন এবং তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত সম্পন্ন করিয়া ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইলেন। আমরাও তাঁহাদের সঙ্গে গিয়াছিলাম। সে দিন ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় কি হইয়াছিল তাহা আমরা বলিব না। কাঙ্গাল হরিনাথ সে দিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন; তাঁহার দিনলিপিতে তিনি এ সম্বন্ধে যে কয়েকটি কথা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

কাঙ্গাল লিখিয়াছেন—"১২৯১ সালের ১১ই মাঘ কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে প্রাতঃকালের আধ্যাত্মিক দৃশ্য।—আনন্দময়ী মায়ের আনন্দময় দৃশ্য ধ্যানযোগে অবলোকন করিয়া আচার্য্যদেবের সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই 'মা মা' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিয়াছিলেন। পরে বহুসংখ্যক নরনারী তৎসঙ্গে যোগদান করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত "মা, মা" বলিয়া ক্রন্দন করিতে থাকেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল 'মা, মা' শব্দে মন্দির প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। একটী যুবক এমন উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন আরম্ভ করিয়াছিলেন

যে, তাঁহার ক্রন্দনে উপাসনার ব্যাঘাত হইবে মনে করিয়া তাঁহাকে মন্দিরের বাহিরে লইয়া যাওয়া হয়। এই প্রকারে সারাদিনে উৎসবের কার্য্য শেষ হইলে গভীর রজনীতে আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় স্বীয় ভবনে যখন বিশ্রামাসন গ্রহণ করেন, তখন আমি তাঁহাকে নিবেদন করিলাম, দেব! অদ্যকার ব্যাপার যাহা আমি দেখিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতে সাহস হইতেছে না; লোকে শুনিলে আমাকে উন্মাদ বা গাঁজাখোর বলিবে। আচার্য্যদেব হাস্য করিয়া বলিলেন, বল, এখানে কোন অবিশ্বাসী নাই। আমি তখন যাহা দেখিয়াছিলাম প্রকাশ করিলাম। আচার্য্যদেবের দর্শনাংশের সহিত ঐক্য হওয়ায় তিনি আনন্দ প্রকাশ করিলেন। পরে আচার্য্যদেবের পুত্র বালক যোগজীবন এবং আমার সঙ্গী আরও একটি যুবক আপন আপন দর্শন প্রকাশ করিলে আমাদের দর্শনের সহিত ঐক্য হইল। পরে আশ্রমবাসিনী কয়েকটী দেবী আসিয়া দর্শনের ভাব স্পষ্ট করিয়া বর্ণন করিলেন। আমাদের দৃশ্যের সহিত ঐক্য হওয়ার পর আচার্য্যদেব আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 'অদ্য ঐরূপ ঘটিবে আমি তাহার কিছুই বুঝিতে পারি নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতিক্রমে উপাসনা করিতেছি, এই মাত্র আমার স্মরণ আছে। হঠাৎ তূলার মত কি যেন মন্দির মধ্যে প্রকাশিত হইল। তাহার পর এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইয়া মহিমামণ্ডপস্থ মহিলাগণের মস্তকোপরি পতিত হইল। তাহার পর সেই জ্যোতিঃ আনন্দময়ী মা হইয়া মন্দিরের মধ্যস্থলে বিরাজ করিয়াছিলেন। অনন্তর তূলার মত জ্যোতিঃ সমূহ এক একটি মূর্ত্তির ভাব পরিগ্রহ করিয়া নৃত্য ও কীর্ত্তনাদি করিতে লাগিলেন। তখন মন্দির বলিয়া কিছুমাত্র অনুভূত হয় নাই, যেন অসীম আকাশে এই অদ্ভুত দৃশ্য পরিলক্ষিত হইতেছে। ধ্যানযোগে ইহাই বুঝিতে পারিয়াছিলাম।' এখন আমার সন্দেহ ও ভ্রম দূর হইল এবং বিশ্বাস জন্মিল আমি উন্মাদ হই নাই বা কোন

প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন করিয়া ঐ প্রকার অপূর্ব্ব দৃশ্য অবলোকন করি নাই।"

উপরিউক্ত কথা কয়েকটি আমরা কাঙ্গালের স্বহস্ত-লিখিত দিন-লিপি হইতে উদ্ধৃত করিলাম। কাঙ্গালের 'ব্রহ্মাণ্ডবেদের' একস্থানেও এই কথার উল্লেখ আছে। ব্রহ্মাণ্ডবেদের প্রথমভাগের ২৯২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে "১২৯১ সালের ১১ই মাঘ প্রাতঃকালে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় যে সময় কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বেদীর কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, সেই সময়ে একটি দৃশ্য প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন অনেকেই 'মা, মা' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়াছিলেন। এই দৃশ্যে মহম্মদ নানকের হস্ত ধরিয়া, নানক আবার অন্য ভক্তজনের সঙ্গে গলাগলি হইয়া 'একমেবা-দ্বিতীয়ং, কীর্ত্তন করতঃ ভাবাবেশে নাচিয়াছিলেন; মহাত্মা রামমোহন রায়ও তথায় উপস্থিত ছিলেন।"

এই ১১ই মাঘের পর পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আর সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজে উপাসনার কার্য্য করেন নাই বলিয়া আমাদের মনে হয়। কারণ এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই আমরা জানিতে পাইয়াছিলাম যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ লোপ হইয়াছিল। গোস্বামী মহাশয় তাহার পরে ঢাকায় চলিয়া গিয়াছিলেন।

১১ই মাঘের পরেও কাঙ্গাল হরিনাথ দুই তিন দিন কলিকাতায় ছিলেন। একদিন পরলোকগত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বাসভবনে কাঙ্গালের গান হইয়াছিল; সেখানেও অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। তাহার পরই কাঙ্গাল কলিকাতা ত্যাগ করেন।

---

# বিবিধ সঙ্গীত।

কাঙ্গাল হরিনাথের বাউল-সঙ্গীতের পরিচয় একটু বিস্তৃতভাবে প্রদান করিলাম। ইহার কারণ এই যে, কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ ফকিরের বাউল সঙ্গীত এক সময়ে বাঙ্গালা দেশের এক অংশে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, ফিকিরচাঁদের গানে যে ভাবে পূর্ব্ববঙ্গ ভাসিয়া গিয়াছিল, তাহার বিস্তৃত পরিচয় না দিলে কাঙ্গাল হরিনাথের জীবন-কথা অসম্পূর্ণ থাকে। এই সমস্ত সহজ ও সরল গানের মধ্য দিয়া কাঙ্গাল হরিনাথকে অনেকে বিশেষ ভাবে চিনিতে পারিবেন মনে করিয়াই তাঁহার অনেক-গুলি বাউলের গান এই পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছি।

কিন্তু ইহা হইতে কেহ মনে করিবেন না যে, কাঙ্গাল হরিনাথ কেবল বাউলের গানই রচনা করিয়াছিলেন, আর কোন গান রচনা করেন নাই। আমরা অতঃপর একে একে তাঁহার অন্যান্য গানের পরিচয় প্রদান করিব।

## ব্রহ্মসঙ্গীত।

কাঙ্গাল হরিনাথের ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি অতুলনীয়। তিনি শুধু গান করিবার জন্য গান রচনা করেন নাই; গান তাঁহার সাধনার অঙ্গস্বরূপ ছিল; তিনি ভগবানকে দিবানিশি তাঁহার গানই শুনাইয়াছেন। তাঁহার সাধন-ভজন সমস্তই গানে। তাঁহার গানের মধ্যে তাঁহাকেই দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এমন অনেক গীত-রচয়িতার নাম জানি, যাঁহাদের রচিত গানের সহিত তাঁহাদের জীবন মিলে না; কিন্তু কাঙ্গাল হরিনাথ

সম্বন্ধে সে কথা বলিবার যো নাই। তিনি মিলের দিকে চাহিয়া কবিতা লিখিতেন না; তিনি ভাষার দিকে চাহিয়া, অলঙ্কারের দিকে নজর রাখিয়া গান রচনা করিতেন না। ভগবানের নাম করিতে করিতে যখন তাঁহার নেত্রে অশ্রু দেখা দিত, মায়ের নাম করিয়া তিনি যখন পাগল হইতেন, তখনই তাঁহার হৃদয়ের মর্ম্মস্থান হইতে পবিত্র মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত হইত, এবং তাহাই গানের আকারে প্রকাশিত হইত। তাই তাঁহার গান শুনিয়া অতিবড় পাষণ্ডের হৃদয়ও গলিয়া যাইত, তাই তাঁহার গান শুনিয়া কত সুপথভ্রষ্ট লোক ঠিক পথে ফিরিয়া আসিয়াছিল এবং এখনও আসিতেছে। যে ব্রহ্মতেজে, যে মায়ের কৃপায় তিনি এই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছিলেন, সংসারের দৃষ্টিতে ভিখারী হইয়াও তিনি যে অমূল্য, অপার্থিব ধনে ধনী হইয়াছিলেন, তাহা তিনি কৃপণের মত গোপনে না রাখিয়া অকাতরে বিলাইয়া গিয়াছেন। তিনি ভগ্ন কুটীরেই বাস করিতেন বটে, অনেক সময়ে তাঁহার দুইবেলা আহার জুটিত না বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার কি করিবে? তিনি যে ভগবৎ প্রেমামৃত পানে বিভোর হইয়া থাকিতেন, তাহাতেই তাঁহাকে পৃথিবীর সুখ দুঃখ হইতে অনেক উচ্চে বসাইয়া রাখিয়াছিল। আর সেই জন্যই তাঁহার সেই উচ্চ সাধনলব্ধ গান জনসাধারণের এত প্রিয়, এত মনোহর, এত শান্তিদায়ক!

কাঙ্গালের ব্রহ্মসঙ্গীতের কথা বলিবার পূর্ব্বে একটী কথা বলার বিশেষ প্রয়োজন বোধ করিতেছি। কেহ কেহ হয় ত মনে করিতে পারেন যে, কাঙ্গাল হরিনাথ ব্রাহ্ম ছিলেন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন, তাঁহারা একস্বরে বলিবেন যে, কাঙ্গাল হরিনাথ সবই ছিলেন। কাঙ্গাল হরিনাথ হিন্দু ছিলেন, কাঙ্গাল হরিনাথ ব্রাহ্ম ছিলেন, কাঙ্গাল হরিনাথ খৃষ্টান ছিলেন, কাঙ্গাল হরিনাথ মুসলমান ছিলেন। সকল ধর্ম্মেই ভগবান আছেন; কাঙ্গালের ধর্ম্ম ভগবানের ধর্ম্ম। তিনি ভগবানকে

চাহিতেন, তিনি হিন্দুকে চাহিতেন না, ব্রাহ্মকে চাহিতেন না, খৃষ্টানকে চাহিতেন না, মুসলমানকে চাহিতেন না—তিনি চাহিতেন পরম দেবতাকে, তিনি চাহিতেন তাঁহার জননী জগদম্বাকে। তাই তিনি যেমন ব্রাহ্ম-সমাজে যাইয়া ভগবানের আরাধনায় যোগদান করিতেন, গানের তরঙ্গ তুলিয়া ব্রাহ্মসমাজ-গৃহকে ডুবাইয়া দিতেন; তেমনি তিনি পরক্ষণেই কালী-বাড়ীতে গিয়াও গান ধরিতেন—

"কাঙ্গাল কা'ল গিয়াছে মা ফিরিয়া ;
তাই কাঙ্গালের মা হোয়েছ মা গায়ের গয়না খুলিয়া!"

তেমনই তিনি দুর্গামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া গান ধরিতেন—

"কোন্ দুর্গা আমার নন্দিনী।"

আবার তাহারই পরক্ষণে হয় ত কোন সংকীর্ত্তনের দলে মিশিয়া গান করিতেন—

"হৃদয়-নিকুঞ্জে স্বরূপ একি অপরূপ হেরি,
নবীনা কিশোরী সনে নবীন কিশোর হরি।"

তাহার পরেই হয় ত মদনমোহন বিগ্রহের নাটমন্দিরে যাইয়া গান করিতেন—

"ওরে বাঁশী, বাজ ধীরে ধীরে,
এত কেন গভীর গরজ তোমার।
বাঁশী-রবে গৃহে জাগে কাল ননদী আমার।"

আবার তাহার পরেই কোন সভায় যাইয়া গান করিতেন—

"এই কি সেই আর্য্যস্থান আর্য্য-সন্তান।
ও যার, যোগবলে, তপোবলে, কাঁপিত দেবতার প্রাণ।"

তাহার পরই হয় ত কোন মুসলমান ফকিরের সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া গান করিতে—

"ওরে মন পাগ্‌লা রে, হর্‌দমে আল্লাজির নাম নিও।
ওরে দমে দমে নিও নাম, কামাই নাহি দিও।"

কাঙ্গাল হরিনাথ এই ভাবেই জীবনযাপন করিয়াছেন। এখন বলুন, কাঙ্গাল কি ছিলেন? যিনি ব্রাহ্মসমাজে বসিয়া গান করিয়াছেন, যিনি চণ্ডীমণ্ডপে মায়ের নাম করিয়া গগন কাঁপাইয়া দিয়াছেন, মায়ের আসন টলাইয়া দিয়াছেন, যিনি নাটমন্দিরে বসিয়া মোহান-মুরলীধারীর নাম করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়াছেন, যিনি আল্লার নাম করিয়া হৃদয়ে শান্তি পাইয়াছেন, তাঁহাকে কোন্ দলভুক্ত করিবেন? কাঙ্গাল কোন দলের কেহ ছিলেন না, কাঙ্গাল সাম্প্রদায়িক গণ্ডী কাটিয়া বাহির হইয়াছিলেন, কাঙ্গাল সম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন না; কাঙ্গালের যিনি সখা, কাঙ্গালের যিনি পিতা, কাঙ্গালের যিনি মাতা, কাঙ্গালের যিনি প্রিয়তম, কাঙ্গালের যিনি প্রিয়তমা, তিনি দেশকাল পাত্রের অতীত ছিলেন, তিনি সকল দেশের, সকল জাতির, সকল বর্ণের আরাধ্য দেবতা, তিনি কাঙ্গালের সর্ব্বস্বধন। সে ধনকে তিনি ব্রাহ্মসমাজেও দেখিতে পাইতেন, ধর্ম্মসভায়ও দেখিতে পাইতেন, চণ্ডীমণ্ডপেও দেখিতে পাইতেন, গীর্জ্জায়ও দেখিতে পাইতেন, মস্‌জিদেও দেখিতে পাইতেন। শ্রীকৃষ্ণ নারদকে বলিয়াছিলেন—

মদ্‌ভক্ত যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।"

কাঙ্গাল এ কথা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন; তাই তিনি যেখানে সেখানে, যে নামে সে নামে গান করিয়াছেন। তিনি জানিতেন সব নামই সেই এক অনামিক প্রভুর পাদপদ্মে পৌঁছিবে। তিনি জানিতেন

"জানি গো জানি গো তারা, তুমি জান মা ভোজের বাজি।
যে তোমায় যে ভাবে ডাকে তাইতে তুমি হও মা রাজি।"

তাই তিনি গান করিয়াছিলেন—

"যিনি সেই মস্‌জিদ্ গির্জ্জায়, ব্রাহ্মসভায়,
শ্মশানে কি গাছের তলে
তিনি মোহন্ত আখ্‌ড়ায়, তুলসীতলায়,
সর্ব্বস্থানে ভূমণ্ডলে।"

সুতরাং কাঙ্গাল হরিনাথকে যিনি যাহা বলিবেন, তিনি তাহাই ছিলেন। কাঙ্গালের ধর্ম্মমত এতই উদার ছিল যে, তিনি সর্ব্বত্র সত্য দেখিতে পাইতেন।

আমার মনে পড়ে একবার তাঁহাকে আমি একটী প্রশ্ন করিয়াছিলাম, "ঈশ্বর সাকার না নিরাকার?" কাঙ্গাল হরিনাথ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন "তোরা যত গোল করিস্ ঐ হ্রস্ব আর দীর্ঘ না বুঝে।" আমি এ উত্তরটা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তিনি আমার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন "কথাটা বুঝলি নে? আগে বানানটা ভাল ক'রে শেখ। তোদের প্রথমে বানান ক'রতে হবে দন্ত্যন'য়ে দীর্ঘ ইকার'নী', 'র'য়ে আকার 'রা', 'ক'য়ে আকার 'কা, আর র—নীরাকার, অর্থাৎ জলের আকার। জল যেমন যে পাত্রে রাখ্‌বি সেই আকার হবে, তিনিও তাই। এই দীর্ঘ ইকার নিয়ে কিছুদিন প্রাণপনে নাড়াচাড়া কর্‌তে কর্‌তে দেখ্‌তে পাবি সে দীর্ঘ আর নেই, কেমন কোরে হ্রস্ব হোয়ে গিয়েছে, 'নিরাকার' হোয়েছে। তারপর আরও নাড়াচাড়া করবি, বানান করবি; তারপর দেখ্‌বি সে হ্রস্বও আর নাই, একেবারে 'নরাকার'। সকল নরনারীই তখন তিনি। কেমন বুঝ্‌লি?" হায় কাঙ্গাল, কি

অযোগ্য শিষ্যকেই উপদেশ দিতে গিয়াছিলে! কি বানরের গলাতেই মুক্তাহার পরাইতে চাহিয়াছিলে। তখনও সেই কথা বুঝি নাই, এখনও যে বুড়া হইয়াছি, এখনও বুঝিলাম না, এখনও হ্রস্ব, দীর্ঘ সমান হইল না, এখনও আকার মুছিয়া গেল না, এখনও সেই অনাদি পুরুষকে নরাকারে দেখিবার, কে জানে কত জন্ম বাকী। কাঙ্গাল আমাকে যে কয়টী কথা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতেই তাঁহার ধর্ম্মমতের সুন্দর আভাস পাওয়া যায়।

এইবার কাঙ্গালের রচিত কয়েকটী ব্রহ্মসঙ্গীত উদ্ধৃত করিতেছি; সকল গান দিতে গেলে একখানি প্রকাণ্ড বই হইয়া যায়। আমি অল্প কয়েকটী গানই উদ্ধৃত করিব।

## অনিত্য সংসার।

দেখ্‌লাম ভেবে সার, সকলই অসার
অনিত্য সংসারে তুমি মাত্র।
পৃথক পৃথক কায়া, কেবল মাত্র মায়া,
ছায়াপ্রায় মায়া না রহিবে আর।
আকাশের মেঘ কত ভাব ধরে,
অবস্থিত নহে তিলার্দ্ধের তরে ;—
তেমতি সংসার, স্বপ্ন-ব্যবহার,
এই দেখি আছে,—দেখি "নাই" আবার।
প্রলোভনী শক্তি পাপ-পুণ্য কথা,
লৌহ আর স্বর্ণ শৃঙ্খল যথা ;
তুমি ভিন্ন আর সকলই যে বৃথা ;
তবে কেন আমি বলি আমার আমার।

## ভিক্ষা।

আমি চাইনে আর
তোমার কাছে অন্ত ভিক্ষে।
তোমার প্রতি গতি মতি,
ভালবাসা দাও হে শিক্ষে।
যেমন সতী যাচে পতি,
পতি গতি সতীর পক্ষে ;
সেইরূপ আশা, মম পিয়াসা,
থাকে যেন তব লক্ষ্যে।

---

## মঙ্গল-আরতি।

বল, সচ্চিৎ-আনন্দ আনন্দবদনে।
গাও, মঙ্গল-আরতি প্রীত মনে প্রতি জনে।
অসীম গগন-থালে, নবভানু দীপ জ্বলে,
প্রভাত-পবন চলে মন্দ মন্দ গন্ধদানে।
ডাকিছে বিহঙ্গগণে, তুরী ভেরি বাজে সঘনে ;
সে তানে মিলায়ে প্রাণে, গুণ গাও রে তানে তানে।
পবিত্র করি হৃদিস্থান, সিংহাসন কর স্থাপন,
প্রেম-অশ্রু বিসর্জ্জনে, ধোয়াও বিভুর শ্রীচরণে।

---

## সর্ব্বব্যাপী।

ভেবে দেখ একবার ;
বাহিরে আছেন যিনি, তিনি অন্তরে তোমার।
যিনি আকাশমণ্ডলে, তিনি আবার ধরাতলে,
যিনি জলে তিনি স্থলে, সম ভাব তাঁর।
ওরে, ভ্রান্ত মূঢ় মন, বৃথা তীর্থ পর্য্যটন,
হৃদে কর অন্বেষণ, দরশন পাবে তাঁর ;—
ভক্তি-কুসুম তুলিয়ে, প্রেম-চন্দনে মাথায়ে,
কাতরে ডাকিয়ে তাঁরে দাও উপহার।

---

## বিশ্বরূপ।

নিঃস্বরূপ রে, কে বলিতে পারে।
যে রূপ সাধক-মানসে, স্ব-রূপ প্রকাশে,
সেইরূপ প্রকাশিতে বাক্য মন হারে।
যে রূপের রূপে রবি তারা শশী,
আকাশে প্রকাশে তমোরাশি নাশি,
যখন, সে রূপের আভা হৃদে লাগে আসি,
নয়ন-জলে ভাসি—ভাসি রূপ-সাগরে।
ঝাঁপ দিয়ে প'ড়ে সে রূপের সাগরে,
একেবারে আমি হারাই যে আমারে,
তখন, তিনি কে আমি কে, চিনিতে কে পারে ?
স্ব-রূপে স্বরূপ মিশে একেবারে।

সে রূপ-সাগরে যে তরঙ্গ দেখায়,
নেচে নেচে ছুটে তরঙ্গ খেলায়,
তখন, ভুবন ভুলায় রে, জীবন জুড়ায়,
মহা-সিন্ধুনীরে ডুবায়-একেবারে।
যিনি পিতা, তিনি মা-রূপে দেন দেখা,
পিতামাতারূপে তিনি প্রেমে মাখা,
দেখ প্রকৃতির রূপে পুরুষরূপ ঢাকা,
স্বগুণে নির্গুণ, রূপ প্রকাশ করে।

## মানব-জীবন।

এই ত মানব-জীবন ভাই।
এই আছে আর নাই।
যেন পদ্মপত্রে জল টলে সদাই,
তেমনি দেখিতে দেখিতে নাই।
আজ গেল, আবার পরে যাবে কেহ,
অনিত্য এই মানব দেহ ;
তবে কেন অহঙ্কারে বল মত্ত সদাই।
যদি যেতে হবে জান নিশ্চয়,
তবে বৃথা কেন কাটাও সময় ;
চিন্ত অন্তের উপায়, কর এখন সত্য আশ্রয়।
সময় যা যাবার, তা গেছে চ'লে,
আর হারাও না মায়ায় ভুলে ;
এখন কাতর হ'য়ে ডাক দীনবন্ধু ব'লে।

---

## আয়ুশেষে।

আয়ু শেষ হ'ল, পলিত কেশ,
দেশে দ্বেষ করি আর কত দিন রবে বিদেশে।
স্বদেশে যেতে সম্বল, পাথেয় কি ক'রেছ বল,
অপার জলধি জল, বল পার হবে রে কিসে ?
সে পথে সব আপন আপন, সঙ্গী নাহি হবে পরিজন,
ধার মিলে না হ'লে প্রয়োজন, কেহ কারে না জিজ্ঞাসে।

---

## সদানন্দময়ী।

মা গো, এই দশা কি তার ?
তুমি সদানন্দময়ী জননী যাহার।
পুণ্য-সুধা-অন্নে ভাণ্ডার পূরিয়ে,
পৃথিবীতে আমায় আনিলে ডাকিয়ে,
সে সুধা ভুলিয়ে, গরল খাইয়ে, জ্বলিতেছি অনিবার।
দেখে আমাদের দশা, কে বল্‌বে সহসা,
আমরা তোমার সন্তান ;
তুমি নিত্য নিরঞ্জন, জ্ঞান-স্বরূপিনী,
আমরা ঘোর অজ্ঞান ;
নিত্যানন্দময়ীর সন্তান হইয়ে, নিরানন্দে আমরা রয়েছি ডুবিয়ে,
মাগো, এ কলঙ্ক হর, আনন্দ বিতর, আনন্দময়ী এবার।

---

## কবি-গান।

এখনকার মার্জ্জিতরুচি শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কবি-গানের নাম শুনিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন যে, কবি-গানের মত অশ্লীল গান বুঝি জগতে আর নাই। কিন্তু এমন একদিন ছিল, আর সে দিনও বহুদূরবর্ত্তী নহে, যখন এই সকল শিক্ষিত মহোদয়গণের পরম পূজনীয় পিতামহ প্রপিতামহগণ এই কবির গান শুনিয়া অতুল আনন্দ উপভোগ করিতেন, এমন কি তাঁহাদের মধ্যে অনেকে হয় ত কবির আসরে দাঁড়াইয়া গান পর্য্যন্ত করিয়াছেন। আমাদের কাঙ্গাল হরিনাথ যখন বালক ছিলেন, তখন আমাদের দেশে কবি গানের বড়ই প্রসার ছিল। বৃদ্ধগণের মুখে শুনিয়াছি, আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামেই দুই তিনটা কবির দল ছিল। বালক হরিনাথ এই সকল কবির গান শুনিতে বড়ই ভাল বাসিতেন। তিনি আমাদের নিকট গল্প করিয়াছেন যে, তিনি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কবি গান শুনিতেন এবং যে গানটী একবার শুনিতেন তাহা আর ভুলিতেন না। তিনি বলিতেন "আমি গান শুনিতাম না, গান গিলিতাম। এক দল যখন 'চাপান' দিয়া যাইত, তাহার পর অপর দল আসিয়া তাহার কি 'উতোর' দেয়, তাহা জানিবার জন্য এমন একটা উৎকণ্ঠা হইত যে, তাহা আর বলিতে পারি না।" এখন বোধ হয় "চাপান" ও "উতোর" এই দুইটী কথার অর্থ বলিয়া দিতে হইবে। আমরা যখন বালক ছিলাম, তখন আমাদের পল্লীগ্রামে কবির গান হইত, আমরা "উতোর" "চাপানের" অর্থ জানিতাম। এখন কবির গান একরকম উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। কোনও কোনও পল্লীতে যে দুই চারিটী দল আছে তাহাদের গান ভদ্রলোকে শুনে না। এই জন্যই "উতোর ও চাপানের" অর্থ বলিতে হইতেছে।

দুই দল না হইলে কবি-গান হয় না। প্রথমে এক দল গীতপ্রসঙ্গে অপর দলের উপর কোনও একটী প্রশ্ন করে। এই প্রশ্ন সাধারণতঃ রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি হইতেই করা হয়। এই প্রশ্নের নাম "চাপান"। এক দল এই চাপান দিয়া গান শেষ করে এবং আসর হইতে চলিয়া যায়; অপর দলকে তৎক্ষণাৎ আসরে উপস্থিত হইতে হয়। দ্বিতীয় দলের লোকেরা আসরে উপস্থিত হইয়া ঢোলের বাজনার সঙ্গে অল্প সময়ের জন্য নৃত্য করিতে থাকে; সেই অবকাশে সেই দলের যিনি সর্দ্দার বা বাঁধনদার তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত গানের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর প্রস্তুত করিতে হয় এবং নৃত্য শেষ হইবামাত্র দলের লোক এই নব-রচিত গানের দ্বারা প্রথম পক্ষের প্রশ্নের উত্তর দেয়—এই উত্তরের নামই "উতোর"। "উতোর" দেওয়া শেষ হইলে দ্বিতীয়পক্ষ প্রথম পক্ষের উপর গীতযোগে "চাপান" দেয়। এই প্রকার প্রশ্নোত্তর ক্রমাগত চলিতে থাকে। কোনও এক পক্ষ অপর পক্ষের প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারিলেই অথবা তাঁহাদের উত্তর আসরে উপস্থিত সমজদারগণের মতে যথেষ্ট বিবেচিত না হইলে সেই পক্ষের পরাজয় হয়। ইহা হইতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, কবির দলেরও ওস্তাদি করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, তন্ত্র, দেশাচার, লোকাচার—এই সমস্ত বিষয়ে যিনি অভিজ্ঞ এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে যাঁহার উপস্থিত কবিতা রচনার ক্ষমতা থাকিত তিনিই কবির দলে ওস্তাদি করিতে পারিতেন। বাল্যকালে কবির গান শুনিতে শুনিতে বা কাঙ্গালের কথাতেই বলি 'গিলিতে গিলিতে' অশিক্ষিত বালক হরিনাথের কবিত্ব শক্তির স্ফূর্ত্তি হয়। হরিনাথের বয়স যখন দশ বৎসর, তখন একদিন আমাদের কুমারখালি গ্রামে দুইটী প্রসিদ্ধ দলের কবির লড়াই হইতেছিল। এক দল "চাপান" দিয়া গিয়াছেন, অপর দলের ওস্তাদ আসরের বাহিরে বসিয়া সেই "চাপানে"র

"উতোর" প্রস্তুত করিতেছেন। যিনি উতোর প্রস্তুত করিতেছিলেন, তিনি আমাদের দেশের একজন প্রসিদ্ধ ওস্তাদ, পাকা বাঁধনদার। প্রতি পক্ষের প্রশ্নের উত্তর তিনি প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু গানের শব্দ-যোজনা কিছুতেই তাঁহার মনোমত হইতেছিল না। অনেক কষ্টে গোড়া মিলিল বটে কিন্তু অন্তরার শেষ কোনও প্রকারে মনের মত হইতেছিল না। এদিকে বিলম্ব হইয়া যাইতেছে দেখিয়া,—আসরে হাততালি দিতেছে—বাঁধনদার অস্থির হইয়া উঠিলেন। হরিনাথের তখন বর্ণজ্ঞানও সম্পূর্ণ হয় নাই। তিনি তখন গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় তালপাতায় "ক খ" লেখেন। হরিনাথ বাঁধনদারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন। স্বীয় অমানুষী প্রতিভাবলে বালক হরিনাথ এমন সুন্দরভাবপূর্ণ শব্দযোজনা করিয়া শেষ চরণটী মিলাইয়া দিলেন যে, সকলে অবাক্ হইয়া গেল।

তাহার পর হরিনাথ যৌবনকালে অনেক দলের ২।৪টী করিয়া গান বাঁধিয়া দিতেন বটে—কিন্তু সহজে কোনও দলের ওস্তাদী করিতে যাইতেন না। তিনি বলিতেন যে, এই প্রকার প্রশ্নোত্তর করিতে করিতে অনেক সময়ে অনেকে অকৃতকার্য্য হইয়া অশ্লীলতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। সেই ভয়েই তিনি ওস্তাদি করিতে যাইতেন না। আমরা শুনিয়াছি একবার দূরবর্ত্তী কোনও গ্রাম হইতে এক কবির দল আমাদের গ্রামে গান করিতে আসেন। গ্রামে যাঁহারা ওস্তাদ ছিলেন, তাঁহারা কেহই উক্ত দলের সহিত প্রতিযোগিতায় উপস্থিত হইতে সাহসী হইলেন না। গ্রামের এমন পরাজয় স্বীকার করিতে অসম্মত হইয়া কাঙ্গাল হরিনাথ বলিলেন, "আমি ওস্তাদী করিব।" গান আরম্ভ হইল, সমস্তরাত্রি "উতোর" "চাপান" চলিতে লাগিল। যাঁহারা গান শুনিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাহারও উঠিয়া যাইবার সামর্থ্য রহিল না। প্রাতঃকাল হইয়া গেল তবুও গান থামে না, তবুও কোনও পক্ষেরই পরাজয় হয় না। বেলা দশটার

সময় গ্রামের প্রধান ব্যক্তিরা সে দিনের মত গান বন্ধ করিয়া দিলেন—রাত্রিকালে পুনরায় গান আরম্ভ হইল। পূর্ব্বদিনের ন্যায় সে রাত্রিও সমভাবে গান চলিতে লাগিল। রাত্রিশেষে হরিনাথ প্রাণপণ শক্তিতে যে "চাপান" দিলেন প্রতিপক্ষ আর তাহার "উতোর" দিতে পারিলেন না; যুবক হরিনাথের নিকট বৃদ্ধ ওস্তাদ পরাজয় স্বীকার করিলেন। অন্য কেহ হইলে, অন্য কোনও দল হইলে, এই বিজয়-গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া তাঁহারা ঢাক ঢোল বাজাইয়া, ধ্বজ পতাকা তুলিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতেন।—কিন্তু যুবক হরিনাথ ভিন্নপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি কোনও দিন বিজয়গর্ব্বে দৃপ্ত হন নাই, কোন দিন শোকে অভিভূত হন নাই—ভগবান তাঁহাকে সে ভাবে গঠিত করেন নাই। দুই দিনের এই মহান্ গীত-সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া কাঙ্গাল গান ধরিলেন :—

দীনবন্ধু, কেমন বন্ধু, জান্‌ব হে সে দিন।
যে দিন আমার দিন ফুরাবে,
শেষের সে দিন নিকট হবে
অজপা দূরে যাবে
দারা-পুত্র-বন্ধু সবে অন্তে দিবে অন্তর্জলী,
হরি বলে কর্ণমূলে মূলবায়ু হইবে লীন।

এত বড় একটা সংগ্রামে জয় লাভ করিবার পর চারিদিক হইতে যখন সেই দরিদ্র যুবকের মস্তকোপরি পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, গুরুজনের আশীর্ব্বাদ অজস্রধারে বর্ষিত হইতে লাগিল, চারিদিক হইতে "সাবাস সাবাস" ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল, বন্ধুগণ তাঁহাকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিতে লাগিলেন, তখন কাঙ্গাল গান ধরিলেন :—

"দীনবন্ধু কেমন বন্ধু জান্‌বো হে সে দিন—"

সামান্য গান হইতেই কাঙ্গালের যে পরিচয় পাওয়া যায়, শতপৃষ্ঠাব্যাপী জীবন-চরিতেও তাহার বর্ণনা করা যায় না।

আমরা নিজের দোষে, শিক্ষার দোষে কাঙ্গালের কবির গান হারাইয় ফেলিয়াছি। গ্রামে যাঁহারা বৃদ্ধ ছিলেন, তাঁহারা অনেকেই চলিয়া গিয়া ছেন। যে ২।৪ জন বাঁচিয়া আছেন, তাঁহারাও কাঙ্গালের কবি-গানে কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। অনেক অনুসন্ধান করিয়া অবসর-প্রাপ্ত পো মাষ্টার পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ প্রামাণিক মহাশয়ের নিক হইতে আমি এই তিনটি গান সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি :—

১। নবীন তীর্থবাসী, এসেছ কোন্ তীর্থ হোতে
বৃন্দাবন তীর্থে।
গোকুলেতে গমন হোল বল কিমর্থে ?
হোয়ে মানের দায়ে উৎকণ্ঠ,
সাজ্‌লেন শেষে নীলকণ্ঠ,
বৈকুণ্ঠেরই নাথ ;
ব্রজনাথ, ভাবে যেন ভোলানাথ ;
দশচন্দ্র নখরেতে,
অর্দ্ধচন্দ্র কপালেতে,
যেন চন্দ্রশেখর হোতে
এলেন চন্দ্রনাথ ॥

———

২। দ্বার ছেড়ে দে দ্বারী রে,

ধরি পায় ধরি রে,

আমাদের প্রাণহরি যে রাজ্য পেয়েছে।

রাজা হোয়ে শ্যাম কেমন বিচার করে,

সুখ্যাতি শুন্‌বো প্রতি ঘরে ঘরে ;

আমি বৃন্দাদূতী, বৃন্দাবনে রাধার দূতী,

দ্বারী বলি তোরে।

---

৩। আমরা মহারাজার দ্বারের দ্বারী,

মহারাজার আজ্ঞাকারী,

রক্ষা করি দ্বার।

সত্য কথা কই তোমায়,

আজ্ঞা বিনা মহারাজার,

ছাড়িতে না পারি এ দ্বার

জানাই গিয়ে মহারাজায়

তোদের সমাচার।

---

# পাঁচালী।

কবি-গানের সঙ্গে সঙ্গেই পাঁচালী গানের আরম্ভ হয়, অথবা কবি গান পাঁচালী গানের পূর্ব্বে বা পরে প্রচলিত হয়, সে ইতিহাস জানি না; বিশেষতঃ এস্থলে সে ইতিহাসের প্রয়োজনও নাই।

আমরা যখন বালক, সেও আজ পঞ্চাশ বৎসরের কথা—তখন আমরা যেমন কবি শুনিতে পাইতাম, তেমনই পাঁচালীও শুনিতে পাইতাম। প্রসিদ্ধ পাঁচালীকার পরলোকগত দাশরথি রায়ের নাম তখন বাঙ্গালা দেশের ঘরে ঘরে শোনা যাইত। সুদূর পল্লীগ্রামে বাস করিয়াও আমরা সেই ছেলেবেলায় দাশুরায়ের নাম শুনিয়াছিলাম। আমরা তখন গান করিতাম—

"তুই কি ঘরে এলি রে রামধন"—

আমরা তখন দুর্গোৎসবের পূর্ব্বে ভিখারী গায়কদিগের মুখে শুনিতাম—

"যাও হে গিরি আন গিয়ে প্রাণের উমা নন্দিনী"—

দাশরথির গান তখন গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে শুনিতে পাওয়া যাইত। এত প্রসিদ্ধি তখন ত দূরে থাকুক, এখনও কোন কবি লাভ করিতে পারেন নাই।

সে কথা থাকুক, আমাদের কাঙ্গাল হরিনাথও প্রসিদ্ধ পাঁচালী-রচয়িতা ছিলেন। আমাদের দেশে এবং পূর্ব্ববাঙ্গালায় তাঁহার রচিত "বিজয়া" "দক্ষযজ্ঞ" প্রভৃতি পাঁচালীর পালা গীত হইত। যাঁহারা দাশরথির ও কাঙ্গাল হরিনাথের পাঁচালী গান শুনিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই

একবাক্যে বলিয়াছেন যে কাঙ্গাল হরিনাথ দাশরথি রায়ের সমকক্ষ ব্যক্তি ছিলেন।

কেহ হয় ত বলিতে পারেন, কাঙ্গাল হরিনাথের পাঁচালী গান যদি এতই উৎকৃষ্ট হইবে তাহা হইলে সে গান তাঁহার বাউলের গানের ন্যায় বিস্তৃতি লাভ করিল না কেন? ইহার দুইটী উত্তর আছে। প্রথম উত্তর এই যে, বাউলের গান শিখিবার জন্য আয়াস স্বীকার করিতে হয় না, সকলেই গাহিতে পারে। এই জন্যই বাউলের গান বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। তাহার পর বাউলের গানের মধ্যে যে একটী সরল সৌন্দর্য্য আছে, যে প্রাণ-মন-মোহকরী উন্মাদনা আছে, অন্য কোন গানে তাহা নাই। বাউলের গান সকলেরই উপভোগ্য, পাঁচালী গান তাহা নহে। কাঙ্গালের পাঁচালীর প্রসিদ্ধিলাভ না করিবার দ্বিতীয় কারণ এই যে, দাশরথি রায় পেশাদার পাঁচালীওয়ালা ছিলেন। তিনি যেখানে বায়না পাইতেন, সেইস্থানেই গান করিতে যাইতেন। কিন্তু কাঙ্গাল হরিনাথ পেশাদার পাঁচালীওয়ালা ছিলেন না। তিনি সখ করিয়া আমাদের গ্রামের সুগায়কদিগকে লইয়া নির্দ্দোষ আমোদ বিতরণের জন্য পাঁচালীর দল করিয়াছিলেন। সে দল কখনও গ্রামান্তরে গান করিতে যায় নাই; গ্রামের ভদ্রসন্তানেরা দল বাঁধিয়াছিলেন, গ্রামেই তাঁহারা গান করিতেন। সেই গানের সুখ্যাতি শুনিয়া আমাদের অঞ্চলের ও পূর্ব্বাঞ্চলের অনেক লোক কাঙ্গাল হরিনাথের পাঁচালী গান শুনিতে আসিতেন। এই সকল লোকের দ্বারাই কাঙ্গালের পাঁচালী গান যাহা কিছু বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে পাংশার প্রাতঃস্মরণীয় জমিদার ভৈরবচন্দ্র মজুমদারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবনাথ মজুমদার ঐ অঞ্চলের সর্ব্বপ্রধান ওস্তাদ গায়ক ছিলেন। পাংশার বাবুদিগের তখন প্রবল প্রতাপ ছিল। লোকে বাবুর নাম করিতে হইলে বলিত "বাবু ত ভৈরব বাবু"।

এই ভৈরববাবুর প্রতাপে বর্ত্তমান নদীয়া জেলার এক অংশ হইতে দুরন্ত নীলকরদিগকে কল-কুঠি তুলিয়া প্রস্থান করিতে হইয়াছিল। সেই ভৈরববাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবনাথ বাবু কাঙ্গাল হরিনাথের পাঁচালী গানের প্রশংসা শুনিয়া তাঁহার গান শুনিবার জন্য কুমারখালিতে আগমন করেন। প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক ও ধর্ম্মবক্তা শ্রীমান্ শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের পিতৃদেব ৺চন্দ্রকুমার তর্কবাগীশ মহাশয় তখন জীবিত ছিলেন। তাঁহারই বাড়ীতে গানের আয়োজন হয়। আমার এখনও বেশ মনে পড়ে যে, আমরা সে দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই অনাহারে তর্কবাগীশ মহাশয়ের বাড়ীতে গান শুনিবার জন্য ধরণা দিয়া বসিয়া ছিলাম। রাত্রি আটটার পর গান আরম্ভ হইল। ইতঃপূর্ব্বে যতদিন এই পাঁচালী গান শুনিয়াছি, সে কয় দিনই কাঙ্গাল হরিনাথ ছড়া কাটিতেন এবং তর্কবাগীশ মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মদনমোহন ভট্টাচার্য্য ও যদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এই দুইজনে দাঁড়াইয়া গান করিতেন, দোয়ারে অন্যান্য গায়ক থাকিতেন। কিন্তু এ দিনে দেখিলাম, কাঙ্গাল পূর্ব্বের মতন দড়া কাটিবার ভার ত লইলেনই, উপরন্তু তিনি ও মদন ভট্টাচার্য্য গানের ভার লইলেন। কাঙ্গালের অসাধারণ শক্তি ছিল; ছড়া কাটা শেষ হইবামাত্র একটুও বিশ্রাম না করিয়া, তৎক্ষণাৎ তিনি গান ধরিতে লাগিলেন। সকলে অবাক্ হইয়া গেল।

আসরে প্রবেশ করিবার পর আখড়াই বাজনা শেষ হইলে কাঙ্গাল প্রথম যে গানটী গাহিয়াছিলেন তাহা আমি যেন এখনও শুনিতে পাইতেছি, সে দৃশ্য এখনও দেখিতে পাইতেছি। কাঙ্গাল গান ধরিলেন—

ভাব রে বীণে তাঁর, মহিমা অসীম যাঁর;
নির্গুণ ত্রিগুণাতীত ভব-সারাৎসার।
দিয়া তব প্রতি গুণ, বাঁধ মম প্রীতি-গুণ;
প্রীতি বিনা গুণ গান সকলই অসার।

জ্ঞান-গুণহীন হরি, বলে বীণায় বিনয় করি,
গুণে বাঁধ ভব তরি, তরি এ সংসার।

প্রসিদ্ধ ওস্তাদ দেবনাথ বাবু এই গান শুনিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। কাঙ্গালের কণ্ঠস্বর যে খুব ভাল ছিল তাহা নহে, তিনি যে রাগ রাগিণীতে খুবই একজন ওস্তাদ ছিলেন, তাহাও নহে; তবুও তাঁহার গান যে শুনিয়াছে সে-ই মোহিত হইয়াছে, সে-ই শতকণ্ঠে তাঁহাকে সাধুবাদ করিয়াছে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে; কাঙ্গাল গাইবার জন্য গাইতেন না, তিনি ওস্তাদী দেখাইবার জন্য কখন গান করেন নাই; তিনি প্রাণ মন ঢালিয়া দিয়া গাইতেন, তিনি নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া যাই-তেন; তাই তাঁহার গানে পাষাণও গলিয়া যাইত; বড় বড় ওস্তাদও তাই তাঁহার গান শুনিয়া মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ করিতেন।

আমরা নিম্নে কাঙ্গাল হরিনাথের দুই পালা পাঁচালী, "বিজয়া" ও "দক্ষযজ্ঞ" হইতে অল্প কয়েকটী গান উদ্ধৃত করিলাম—

১। "হবে কুলক্ষণ তথায় বিলক্ষণ;
সতী যেওনা প্রজাপতির যজ্ঞে;
শিব অপমান, হবে যজ্ঞস্থান, শ্রবণে মর্ম্ম-বেদনে,
ওগো নারিবে জীবনে করিতে রক্ষে॥
আমি শ্মশানবাসী, শ্মশান ভালবাসি,
দেবের যজ্ঞভাগে নহি অভিলাষী;
তাই ত্যজে সোণার কাশী, চিতাভস্মরাশি,
মাখি, দিশি দিশি করি হে ভিক্ষে॥

অসহ্য ঐশ্বর্য্য মাৎসর্য্য ব্যবহার,
মান অপমান সমান আমার ;
যে যা বলে বলে, হরি দিল ভার ,
ঐ যোগে যোগী, কর হে দীক্ষে ॥"

---

২। "কুবের, ভূষণে কি কাজ রে আমার।
নিত্য-ভিক্ষা, ভবন বসন নাহি আসন যার ॥
নিঃস্ব আমার বিশ্বনাথ ভস্ম মাখেন গায়,
আভরণ প্রয়োজন কি আছে রে আর ॥
সবাই বলে সতীর পতি ক্ষেপা মহেশ্বর,
শ্মশানে মশানে ফিরে কেহ না মানে তাঁর ॥
হরি কহে সবিনয়ে সতীর ব্যবহার,
পতি কেবল সতীর গতি পতি অলঙ্কার ॥"

---

৩। "কি করিব বাস।
শিব জগৎ-গুরু, কালী কল্পতরু, মূলে নিবাস।
চতুর্বর্গ ফল ফলে, মহেশে সাধিলে,
পরিত্রাণ পায় ভব-জলধি জলে ;
নাহি সামান্য ফলে মম অভিলাষ ॥
নাহি মম আকিঞ্চন, রজত কাঞ্চন,
তুচ্ছ করি চন্দন, করি ভস্ম ভূষণ ;
চন্দ্রচূড় প্রভু হরি চন্দ্রনাথের দাস ॥"

---

৪। "শিব চরণ কৈবল্য ধাম।

ঐ যে সংসার-বন্ধন, মুক্তির কারণ, অজস্র সাধে সহস্রলোচন;

সহস্রকিরণ শশী আসি করে শশিশেখরে প্রণাম॥

তন্ত্র মন্ত্র বেদ বিধি যন্ত্র গান, নিদানে শিবের নিদান বিধান;

ত্রিজগৎ শিব-মন্ত্রে পায় জ্ঞান, তাইতে জগৎগুরু নাম॥

এমন কৃপানিধি কে আছে আর ভবে,

অসম্ভব সব ভবেতে সম্ভবে, গরল খেয়ে জীর্ণ কে করেছে কবে,

ফণী ধরে অবিশ্রাম॥"

---

৫। "শ্রীচরণে স্থান দাও হে, প্রাণ যায় প্রাণকান্ত।

পিতা দক্ষ, হয়ে রুক্ষ, দহে বক্ষ, আজ নিতান্ত॥

তব আজ্ঞে, আজ অবজ্ঞে, আসি যজ্ঞে, হ'ল মানান্ত;

ক্ষমা কর, হে শঙ্কর, সে পাপ হর, ত্রিপাপান্ত॥

নিষেধিলে সদানন্দ, তাইতে আমি করি দ্বন্দ্ব,

বলিলাম তোমায় কত মন্দ, হয়ে ভ্রান্ত;

তার প্রতিফল, হ'ল সফল, পতি অযশ-গরল,

হয়ে নারী, সইতে নারি, পতি নিন্দা অবিশ্রান্ত॥

---

৬। "পতি নিন্দা শুনি সতী সকাতরা।
পতিত ধরণী, পতিতপাবনী,
চৈতন্যরূপিনী, হল চৈতন্য-হারা॥
পতিনিন্দা কাল ভুজঙ্গিনী হয়ে,
শ্রবণ-বিবরে পশিল হৃদয়ে;
দংশিল অন্তরে, হৃদয় বিদরে,
বিষের জ্বালায় কালী, কালী কাল-দারা॥
বিবর্ণ হইল সুবর্ণ-মূরতি,
শশী-মুখে মসীরাশি আসি স্থিতি;
পতি পশুপতি প্রতি রেখে মতি,
যোগেন্দ্রমোহিনী তারা মুদে তারা॥"

---

৭। "সতীশোকে পতিত পাবন, পশুপতি পতিত ধারা।
সুন্দর রজতগিরি, ধরা লোটায়, না যায় ধরা॥
জীবনতারা বিনা তারাপতি, হল রে আজ জীবন-হারা;
অন্য ধ্বনি নাহি শুনি, ধ্বনি কেবল তারা তারা;
ত্রিনয়নের নয়ন-তারায়, তারাকারা ধারা॥
ওরে নিরানন্দে সদানান্দ, নন্দীকে বলিলেন ত্বরা,
কি বলিলি ওরে নন্দী, তারা কি হলেম হারা;
ভবের আপদ যায় রে দূরে, চিন্তা করি যে তারা-পদ;
তারাপদ দক্ষযজ্ঞে, দিলি নন্দী কি সংবাদ;
কোথা আপদ-ভঞ্জিনী, হৃদি-রঙ্গিনী তারা॥"

৮। "কিবা দোষে দোষী করি, নিজ দাসে পরিহর, হরশঙ্করী।
তোমা বিনে কেমনে কাল হরি ;
( ওহে ) হর-পাপহর, হর-তাপহর, হরপ্রাণ-প্রাণহরী॥
তোমা বিনা সতি, নাহি অন্য গতি, আমি ক্ষেপা ত্রিপুরারী ;
আমি বড় ক্ষুধার কালে, অন্নপূর্ণা বলে, ডাক্‌লে দাও হে অন্ন বারি॥
শিবে আর কি তোষিবে, আশুতোষ শিবে,
দুঃখ বিনাশিবে, আসি ভবে, কৈলাস-শিখরে প্রকাশিবে,
সুখশশী আসি সুখেশ্বরী ;
কবে সদানন্দে কর্‌বে সদানন্দ ; আনন্দ বিতরণ করি ;
( ওগো ) সদানন্দময়ী,
নিরানন্দে আর কতদিন রহিবে হরি॥"

---

৯। "উমা নহে তোমার নন্দিনী।
ভবতারিণী, ভবমোহিনী ; তারা ত্রিতাপহারিণী,
দুঃখ-নিবারণী, ব্রহ্মসনাতনী॥
বেদের মর্ম্ম এই শুনগো জননী, নিরাকার ব্রহ্ম ভাবে তত্ত্বজ্ঞানী,
সাকারেতে আবার ব্রহ্মসনাতনী, ত্রিজগতবন্দিনী।
অসম্ভব সব তাঁহাতে সম্ভব, মায়াতে উদ্ভব:বিধি বিষ্ণু ভব,
শক্তিরূপে আদ্যাশক্তি মেয়ে তব, জগতপ্রসবকারিণী॥
তিনি মহামায়া দেবের অসাধ্য,
মায়াতে আছেন জগত আবদ্ধ,
কাটে মায়াপাশ কার এমন সাধ্য, শুনগো জননী॥"

---

১০। "এস কোলে করি উমা, বল মা বিধুবদনে।
তোমার মারে মা বলে মা, কে আছে আর তোমা বিনে॥
দুঃখিনী জননী ব'ধে, ঈশানী যাবে কেমনে;
তুমি আমার নয়নতারা, তোরে বিদায় দিয়া তারা,
তারাহারা নয়নে রব কেমনে ভবনে॥
ওমা তিন দিনের তরে আসিয়ে, নিবান আগুন জ্বেলে দিয়ে,
নিদয় হ'য়ে বিদায় দিতে বল গো কি কারণে।
প্রাণান্তে নয়ন-প্রান্তে, যেতে দিবনা তোমা ধনে;
সাগর-সিঞ্চন নিধি, ভাগ্যেতে মিলান বিধি,
নিজ দোষে হারাই যদি, পাব না জীবনে।"

---

১১। "আগে নিবেদন করে রাখি।
অকৃতি সন্তানে, স্থান দিও চরণে,
অন্তে তারা আমায় দিও না ফাঁকি॥
দিনে দিনে যত গত হচ্ছে দিন,
নিকটে আসিছে শেষের সে দিন;
দিনমণি-সুত বাঁধিবে কোন্ দিন,
সে দিনের ক'দিন আছে মা বাকি॥
বাসনা সময়ে ডাকিব তোমাকে,
কি জানি রসনা বশ না থাকে;
অন্তিমকালে তারা ভুল না আমাকে,
অজ্ঞানে সজ্ঞানে যে ভাবে থাকি॥"

কাঙ্গালের পাঁচালীর পালাগুলিতে যে সমস্ত ছড়া বা কবিতা আছে

তাহা যেমন সরল তেমনি সুন্দর, তেমনি কবিত্ব ও উপদেশপূর্ণ। এই ছড়াগুলির কোন্‌টী রাখিয়া কোনটী উদ্ধৃত করিব, তাহা নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। নিম্নে যদৃচ্ছা দুইটী ছড়া উদ্ধৃত করিলাম। ইহা হইতেই পাঠকগণ কাঙ্গালের পাঁচালীর কথা বুঝিতে পারিবেন।

দেবর্ষি নারদ কৈলাসে উপস্থিত হইয়া দাক্ষায়ণী সতীকে দক্ষযজ্ঞের সংবাদ দিলেন এবং তাঁহাদিগের যে নিমন্ত্রণ হয় নাই, এ কথাও জানাইলেন। যজ্ঞ দর্শনের জন্য উদ্বিগ্না হইয়া সতী মহাদেবকে বলিতেছেন—

"সতী কন কৃত্তিবাসে, কন্যা যাবে পিতৃবাসে,
নিমন্ত্রণ কিবা প্রয়োজন।
জামাই পরের ছেলে, নিমন্ত্রণ নাহি পেলে,
কেন যাবে শ্বশুর-ভবন॥
শুন ওহে শূলপাণি, রয়েছে প্রবাদবাণী,
জামাতা কি ভাগিনেয়গণ।
কখন আপন নয়, অনুগত নাহি হয়,
যত দাও তত আকিঞ্চন॥
কিছু ত্রুটী পেলে পরে, ধড়ে নাহি রাগ ধরে,
দ্বন্দ্ব করি মন্দ বলে কত।
জামাই ভগিনী-পুত্র, আপন না হয় কুত্র,
শত্রু মধ্যে গণে বুধ যত॥
তব অপমান তরে, পিতা মম যজ্ঞ করে,
অসম্ভব, সম্ভব কি হয়?
বহু কার্য্য আছে যার ভুল হয়ে থাকে তার,
তাহাতে রাগে না সদাশয়॥

৺মথুরানাথ মৈত্রেয়।

জঠর কঠোরে স্থান, দশ মাস করি দান
সন্তান প্রসব করে মাতা।
লালন পালনে তাঁর, যে যাতনা অনিবার,
সহগুণে মাতা বসুমাতা॥
যার মায়া কিমদ্ভূত, এক অঙ্গে ধরে সুত,
মল-মূত্রে আর অঙ্গ ভরা।
অতি শীতে জড়সড়, তথাচ না বলে সর,
মায়ের তুলনা নাই ধরা॥
খেতে ভাল লাগে যাহা, জননী না খান তাহা,
তুলে দেন সন্তানের মুখে।
কাতর পীড়ার দায়, শিশু যদি নাহি খায়,
বড় ব্যথা লাগে মার বুকে॥
মা যখন খান ভাত শিশু পাতে দুটী হাত,
জননী চিবায়ে দেন হাতে।
কি মধুর তার তার, যে খেয়েছে একবার,
সে জানে কত মধু তাতে॥
কার সাধ্য আছে আর, জননীর এক ধার
দুগ্ধধার শুধিবারে পারে।
সন্তান-কুশল তরে, হৃদয় বিদীর্ণ করে,
রক্ত দেন মাতা দেবতারে॥
মাতৃহীন যেই জন, সে জেনেছে মা কেমন,
স্নেহের রতন এ সংসারে।
স্বয়ম্ভু হে শম্ভু তুমি, নাই তব জন্মভূমি,
জান না মা বাপ বলে কারে॥

তুচ্ছ মান ভয়ে হর, তাই হে নিষেধ কর,
যেতে পিতামাতার ভবন।
ইথে নাই অপমান, কন্যা যাবে পিতৃস্থান,
দেখিতে মা-বাপের চরণ ॥"

পতি-নিন্দা শ্রবণ করিয়া সতী পিতা দক্ষকে বলিতেছেন—

—পতি-নিন্দা শুনি সতী, ভাসে অশ্রুজলে।
বিদরিয়া যায় বুক, দক্ষে ডেকে বলে ॥
"আপনি এসেছি পিতা নিমন্ত্রণ নাই।
দুঃখিনী বলিয়া কর, অপমান তাই ॥
ভিখারীর নারী বলে, ঘৃণা কর কত।
নিঃস্ব নয় বিশ্বনাথ বিশ্ব অনুগত ॥
কুবের ভাণ্ডারী তাঁর, সুখ ইচ্ছা নাই।
ত্যজিয়া সোণার কাশী, গায়ে মাখে ছাই ॥
পতি যার ত্রিলোচন, ত্রিদেব-লোচন ;
তার কিবা প্রয়োজন সামান্য ভূষণ ॥
পতি যার চন্দ্রনাথ চন্দ্র শোভে শিরে।
তার ভার্য্যা কি করিবে, তুচ্ছ মণি হীরে ॥
পতি যার পশুপতি, দেবতার পতি।
পট্টবাসে তুষ্ট নয়, তার ভার্য্যা সতী ॥
নারীর ভূষণ পতি, কহেন বিদ্বান্।
সতীর ভূষণ পতি, দয়ার নিধান ॥
সহ্য করা যায় পিতা অহির দংশন।
সহ্য করা যায় পিতা সতিনী-গঞ্জন ॥

সহ্য করা যায় পিতা, অনলের তাপ।
সহ্য করা যায় পিতা, গুরুজন-শাপ॥
বজ্রাঘাত হ'লে বুকে সহিবারে পারি।
নারী হ'য়ে পতি-নিন্দা সহিবারে নারি॥
এত বলি মহামায়া করেন ক্রন্দন।
মুদিত নয়নতারা, হারান জীবন॥"

---

# নাটক।

কাঙ্গাল হরিনাথ শুধু বাউলের গান, ব্রহ্ম-সঙ্গীত, কবি পাঁচালী প্রভৃতি রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি অনেকগুলি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। গ্রামের যুবকগণ যাহাতে নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগ করিয়া সময় অতিবাহিত করিতে পারেন, সেইজন্য তিনি কয়েকখানি পৌরাণিক নাটক রচনা করেন এবং নিজেই শিক্ষা দিয়া যুবকগণের দ্বারা মধ্যে মধ্যে সেই সকল নাটকের অভিনয় করাইতেন। যদি কখনও কাঙ্গাল হরি-নাথের সাহিত্য-সাধনার পরিচয় দিবার অবকাশ লাভ করিতে পারি, তখন নাটকগুলিরও বিশেষ পরিচয় প্রদান করিব। এক্ষণে তাঁহার কয়েকখানি নাটক হইতে অল্প কয়েকটী সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া দিতেছি।

নিম্নলিখিত গান কয়টী তাঁহার প্রণীত "অক্রুর-সংবাদ" গীতাভিনয় হইতে গৃহীত হইল—

১। "মন ভজ রে নিত্য নিত্য, সত্য সনাতন নিত্য,
সত্য বিনে শান্তি নাই আর, জেন এই সত্য সত্য।
সত্যসেবায় আত্মশুদ্ধি, দূরে পলায় ভ্রমবুদ্ধি
সত্যতত্ত্বে জ্ঞানবৃদ্ধি সুপ্রকাশ্য আত্মতত্ত্ব॥
লইলে সত্যের শরণ, অহঙ্কার না থাকে কখন,
দ্বেষ হিংসা কাম ক্রোধ দূরে করে পলায়ন।
সত্যকে রাখিলে হৃদে, ডোবে না জীব পাপহ্রদে,
সত্য কলুষ সংহারে, প্রকাশে বিভু-মাহাত্ম্য॥

সত্য ভিন্ন ধর্ম্মকর্ম্ম, ধর্ম্ম নয় সে ধর্ম্ম মর্ম্ম—
ভেদ করা কলুষ অস্ত্রে, মনে জেনো নিশ্চয়।
শুন ওরে ভ্রান্ত মন, সত্য পথে কর ভ্রমণ,
ষড়রিপু হবে দমন, পাবে পরম পদার্থ।”

---

২। “শোন্ রে বীণে! বল্‌বি নে, কেবল হরিনাম বিনে,
ক্ষণকাল বিফলে বীণে! হরি বিনে হরিবি নে॥
যেতে ভবপার বীণে, পার-বিনে পারবি নে,
যে সঙ্কটে হরিপদ-তরি বিনে তরিবি নে॥
প্রতি তারে প্রীতি তাঁরে, কর বীণে নিশিদিনে,
তারে তারে তারে তারে তাঁরে ডাকরে বীণে॥
অপার ভবদুস্তরে, কে তারে আর তাঁরে বিনে,
বীণে, রাধারমণ বিনে, কুপথে মন দিবি নে॥
যাগ বিনে:জাগবি নে সংসার-যাত্রায়, রাগ বিনে রাগবি নে অন্যেরই কথায়,
যোগে কেবল জাগে যোগী, জাগে না যে ভোগী রোগী,
জেনে শুনে বৃথাভোগী, ভাবী ভাবনা ভাবি নে॥”

---

৩। "বুঝি হবে এই বৃন্দাবন।

আহা মরি, কিবা হেরি, সদানন্দ ধাম,

সদানন্দ যে ধাম, ভাবেন অবিশ্রাম, পূর্ণ মনস্কাম;

ভাগ্যে সেই ধাম, করিলাম দরশন॥

কুসুমিত যত কুসুমতরুগণ, অবিরত করে কুসুম বরিষণ,

মধুব্রত করে মধু অন্বেষণ, মধুর স্বরে হরে মন।

উচ্চপুচ্ছ করি নাচিছে শিখীতে, নর্ত্তকী না পারে সে নৃত্য শিখিতে,

শারী শুকের নিত্য সুখের ধ্বনিতে, ধ্বনিত পবন বন॥"

---

## ভাবোচ্ছ্বাস।

কাঙ্গাল হরিনাথ "ভাবোচ্ছ্বাস" নামে একখানি অতি সুন্দর পরম উপাদেয় নাটক রচনা করিয়াছিলেন। এই নাটকখানি কতবার যে আমাদের গ্রামে অভিনীত হইয়াছিল তাহার সংখ্যা করা যায় না। আমাদের গ্রামখানি বৈষ্ণব-প্রধান। সেই জন্যই এই নাটকখানি এত আদর লাভ করিয়াছিল। বৈষ্ণব কবিগণ যে সমস্ত রসের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন, কাঙ্গাল হরিনাথ এই "ভাবোচ্ছ্বাসে" তাহা এমন সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত করিয়াছেন যে, তাহা পাঠ করিলে হৃদয় পুলকিত হয়। এই স্থানে আমরা কেবল কয়েকটী উচ্ছ্বাস লিপিবদ্ধ করিব।

(১) পূর্ব্বরাগে মধুর রসোচ্ছ্বাস। এই উচ্ছ্বাসে শ্রীরাধা বলিতেছেন:—

"আমার ব্যাকুলিত মন।
গৃহেতে রহে না, প্রবোধ মানে না, সদা ভাবে জলদবরণ॥
নিঠুর ব্যাধের বাঁশরী শুনিয়ে,
হরিণী যেমন বেড়ায় হে ছুটিয়ে,
আমি সেইরূপ হোয়ে (বঁধু হে), এলাম হে ধাইয়ে,
দেখা দাও রাধারমণ॥
নব মেঘের উদ্দেশে, বৃক্ষ ডালে ব'সে
চাতকিনী সদা ডাকে যেমন;
আমি সেইরূপ হোয়ে, লুকায়ে লুকায়ে
হৃদয়ে ডাকি সর্ব্বক্ষণ;
সে পাপ ঘরে আমার কুললাজ অরি,
হৃদয় খুলে তোমায় ডাকিতে না পারি,
আমি গুমরিয়ে মরি দিবস শর্ব্বরী,
ঝুরে দুনয়ন॥"

(২) বাৎসল্যরসোচ্ছ্বাস। (৩) রূপানুরাগরসোচ্ছ্বাস। এই উচ্ছ্বাসের একটী গান দিলাম:—

"হরে প্রাণমন, সে বাঁকা নয়ন,
ওরে, নন্দনন্দন ত্রিভঙ্গ;
শয়নে স্বপনে, সদা জাগে মনে,
মন উচাটন, না মানে বারণ,
শ্যামের প্রীতি অঙ্গ লাগি, কাঁদে প্রতি অঙ্গ।

দেখ্‌ব না বলিয়া বসন দিলাম ঢাকা,
নীলাম্বরী মাঝে দেখি ঈষদ্ বাঁকা ;
ইথে কিলো সই কুল যায় রাখা,
বুঝি দুকুল ডুবায় অকুল তরঙ্গ ॥
সুনীল আকাশে সে নীলবরণ,
নীলোৎপল দলে দলিত অঞ্চল ;
ময়ূর কণ্ঠ আরো উৎকণ্ঠা কারণ,
যথা ফিরাই আঁখি দেখি কাল অঙ্গ ॥"

(৪) সাধারণরসোচ্ছ্বাস। (৫) উৎকণ্ঠামধুররসোচ্ছ্বাস। (৬) বিপ্রলব্ধ মধুররসোচ্ছ্বাস। এই উচ্ছ্বাসের একটী গান উদ্ধৃত করিলাম :—

"(জয়)রাধে, বদসি যদি কিঞ্চিত।
নীলাঞ্চল আবৃত বচন অমৃত, মুখে যাও বল, যাই জন্মের মত ॥
জীবনের জীবন মন প্রাণ রাই, তোমা বিনে আমার আর কেহ নাই ;
তুমি দিলে বিদায়, যাব আর কোথায় (রাধে,)
আমি চিরদিন তোমার চরণ আশ্রিত ॥
তোমা ভিন্ন প্যারী অন্য কার নই, তোমার জন্য আমি নন্দের বাধা রই ;
শিক্ষা বাঁশীযন্ত্রে, দীক্ষা রাধা মন্ত্রে, (রাধে,)
আমি দাস-অনুদাস চির অনুগত ॥"

(৭) কলহান্তরিতা মধুররসোচ্ছ্বাস। এই সাতটী উচ্ছ্বাসে যে কয়টী সুন্দর গান আছে, তাহা আমরা দিয়া উঠিতে পারিলাম না। প্রত্যেক গানই অপূর্ব্ব রসে পরিপূর্ণ।

## বিবিধ সঙ্গীত।

কাঙ্গাল হরিনাথের সহস্র সহস্র গীতরাশি হইতে এই স্থানে অল্প কয়েকটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এই গান কয়েকটীর বিষয়-বিভাগ বা কোনও পরিচয় প্রদান করিলাম না। গানগুলি পাঠ করিলে সকলেই তাহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবেন।

১। "ওহে, অনামিক হরি তুমি, তোমার এ নাম কে রেখেছে।
(হরি) নামের সুধা পান করিয়ে জগৎ মেতে উঠিয়াছে॥
(বোল হরিবোল বলে রে)
ভক্ত আমার পিতা মাতা, ভক্তই আমার আশ্রয়দাতা;
ভক্ত-হৃদে জন্মে থাকে, ভক্তই আমার নাম রেখেছে॥
(ভক্তাধীন ভগবান্ রে)॥
ভক্তের নামে নামী তুমি, একথা জানিলাম আমি;
ওহে, বিশ্বরূপ বিশ্বস্বামী, এরূপ তোমার কে দিয়েছে॥
(তাই আমায় বল হে)
শোন্‌রে আমার রূপের তত্ত্ব, আমি অসৎ আমি সত্য;
যে জীবের যেমন চিত্ত, সে জন সেইরূপ রূপ দেখেছে॥
(যেমন হৃদয় তেমনি রূপ হে)
তুমি, বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বর, ভক্ত-ইচ্ছায় রূপ ধর;
আছ, সর্ব্বস্থানে নিরন্তর, লোকে কেন না দেখিছে॥
(হরি তোমার অপরূপ হে)
অপ্রকাশ আমি বটে, বিরাজ করি সর্ব্বঘটে;
প্রকাশ হই রে তার নিকটে, ভক্তি কোরে যে ডাকিছে॥
(ভক্তবৎসল ভগবান্ রে)

আমায় ডাক্‌লে ভক্তি কোরে, যাই আমি চণ্ডালের ঘরে ;
ভক্তি কোরে না ডাক্‌লে রে, নাহি যাই ব্রাহ্মণের কাছে ॥
(ভক্ত আমার, আমি ভক্তের রে)
ভক্ত আমার পিতামাতা, ভক্ত আমার আশ্রয়দাতা
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করি, ভক্তই আমার রূপ দেখেছে ॥
(আমি ভক্তের, ভক্ত আমার রে)

---

২। "সখি ! সে কালীয়নটে, যমুনার তটে,
যদি আজ দেখা পাই গো।
তারে, বলিব রে সখি, যার বাঁকা আঁখি,
কখন কি লাজ নাই গো।
(তার) ( লাজ থাকৃতে কি এমন করে )
ধরে, কুলবধূর নাম, সদাই করে গান,
ঘাটে বাটে দশের মাঝে গো।
ও, শ্রীনন্দ-কানাই, গরব করে তাই,
বলিবার কেউ না আছে গো ॥
(উহার গুণের কথা)
তারে, বল্‌ব কথা ছুট, নয় শোনে সে নট,
তবে ঘরে না যাইব আর।
সেই, পাষাণে ধরিয়ে হৃদয়ে রাখিয়ে
জলেতে দিব সাঁতার গো ॥
(আমি জন্মের মত) (কাল, শ্রীযমুনার)

সখি, সে পাষাণ বুকে, যদি বাঁধা থাকে,
ডুবিব জনমের মত।
( যে আমার কুলে কলঙ্ক করিল )
( যে আমার জাতিকুলে কাঁটা দিল )
আমি, ডুবে বারেবার, ভাসিয়ে আবার
তাই যে কলঙ্ক এত গো ॥
(আমার ঘরে পরে)

আমি, আর না উঠিব, জলে ডুবে রব,
ভুলিয়ে কুলের সাঁতার।
( মীনের মত ডুবে রব ) ( গভীর জলের )
(ডুবে থাকে) (সিন্ধুজলের মকর যেমন)
ও তাই, কহে ফিকির দীন, গভীর জলের মীন ;
ভাসিয়ে না উঠে আর গো।
(সাঁতার ভুলে ডুবে থাকে)

ওরে, কাঙ্গাল বলে, কৃষ্ণপ্রেম-সিন্ধুজলে,
যেজন ডুবেছে সাধু কৃপাবলে ; সে কেন ভাসিবে,
সে কেন ডুবিবে, ভাসা ডুবা জ্ঞান নাই গো ॥
(তার) ( সে যে সে জ্ঞান হারায়েছে ) ॥

---

"আহা ! কি হেরি, হরিলীলাকারী, কভু পুরুষ কভু নারী।
রাধার, হৃদাম্বর মাঝে, পীতাম্বর সাজে, বাহিরে বিরাজে দিগম্বরী ॥
(আজ) (রাই রক্ষার তরে)

আহা, রাধা দেখে বাঁশী, আয়ান দেখে অসি, মুক্তকেশী
শ্যামাসুন্দরী,
ওরে যেমন ভাবে, শ্রীরাধামাধবে, তেমনি দেখে ভাবের ভাব
মাধুরী ॥
(ও সে যারে যেমন ভাব)
হরি, কখন সুন্দর, নবজলধর, কখন নবীনা রাই কিশোরী ;
কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদে কয়, তর্কে দূরে রয়,
বিশ্বাসে মিলয় বংশীধারী ॥
( কেবল )

---

৪। "দেখ্ ললিতে ! আচম্বিতে শ্যাম যে আমার শ্যামা হোল।
ঐ সে, চূড়াবাঁধা যুক্তবেণী, মুক্ত হোয়ে পায়ে পোল ॥
( যাতে গুঞ্জছড়া ছিল ) ( যাতে ময়ূরপাখা ছিল )
ছিল শ্যামের পীতাম্বর, কে করিল দিগম্বর,
ও কে, বনমালা কেড়ে নিয়ে, মুণ্ডমালা গলে দিল ॥
( কার এমন কঠিন হৃদয় ) ॥
ধড়া বেড়া ছিল কটি, কর বেড়া কোটি কোটি,
করে বেড় না পায়, ঘুরে বেড়ায়, দিগম্বরী হরি তাই লো ॥
( লীলাম্বরে কোটী করে )
অধরে অধর হাসি, চমকে চপলারাশি ;
শ্যামের মোহন বাঁশী ভীষণ অসি,
আঁখি দেখি রক্তোৎপল ॥
( কুলবালার কুলহরা )

ব্রজাঙ্গনার মন উদাসী, করেছিল মোহন বাঁশী ;
বাঁশী, কেড়ে নিয়ে দিয়ে অসি, কুলনারীর কুল রাখিল ॥
( কে এমন সুহৃদ্ বল)
অজ্ঞান আয়ানের ভয়ে, থর থর কাঁপে হিয়ে ;
ও তাই, রসরঙ্গ ভুলে গিয়ে, রণরঙ্গে মেতে গেল ॥
( ওরে আহা মরি একি হেরি )
শ্যাম-শোভা, মনোলোভা, রক্তোৎপল লোল জিহ্বা ;
আবার রক্তজবা রক্তমাথা, ভক্ত রাঙ্গা পদে দিল ॥
( এই কাঙ্গাল ফিকির দেবে কিবা )”

---

৫। "ওগো কিশোরি ! তোমার বংশীধারী, হলেন আজ শ্যামাসুন্দরী,
রূপের তুলনা কি আছে
( ধনী লো )
ত্রিভুবন মাঝে, পীতাম্বর হরি, দিগম্বরী ॥
( আজ )
আহা ! তোমার বনমালী কৃষ্ণ হোলেন কালী,
শিব সাজ তুমি, যুগল হেরি ;—( আমরা আবার )
হেরি, তোমরা যা ছিলে তাই হও গো প্যারী ॥
আমরা বনফুল তুলিয়ে, পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে,
শিব কালী যুগল পূজা করি ॥

ভক্ত যেমন বাঞ্ছা করে, তেম্‌নি রূপ ধরে, ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু হরি,
কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদে কয়, ( হায় রে ) বিশ্বাসীর হৃদয়,
বিশ্বরূপে দেখে বিশ্বম্ভরী ॥"

---

৬। "শ্যাম আর শ্যামা আমার, ভিন্ন ভেদ কোথায় বল।
অবর্ণ আবর্ণ উভয়, সবর্ণ তাই দীর্ঘ হোল ॥
যদি হোত অসবর্ণ, ( তবে ) সবর্ণ হোত বিবর্ণ ;
দৃষ্টান্ত হরিদ্রাচূর্ণ, রক্তবর্ণ পৃথক্ ফল ॥

হ্রস্ব দীর্ঘ বর্ণাভিন্ন, যে শ্যামবর্ণ সেই শ্যামাবর্ণ,
প্রকৃতি পুরুষ অভিন্ন, আত্মা তার দৃষ্টান্তস্থল,—
কেশ বিনা হয় সুবেশ, কোথায় অমুক্ত কেশ চূড়া মাথায়,
মুক্ত হোলে পদে লোটায় মুক্তকেশীর কেশজাল ॥

বর্ণমালা মুণ্ডমালায়, বর্ণমালায় ঐ সমুদায়,—
অসি বাঁশী ভিন্ন কোথায়, ভক্ত উদ্ধারের ছল ;—
কাঙ্গালের নাই ভিন্ন ভাব শ্যামা যে মা,
শ্যাম ধরা, দুয়ে মিলে শ্রীমাধব
একাধারেতে যুগল ॥"

---

৭। "মা আমার মুক্তকেশী, এইখানে যে দাঁড়িয়ে ছিল।
ও কে মুক্ত কেশ যুক্ত করে, মাথায় চূড়া বেঁধে দিল॥
(ও রে, আহা মরি, একি হেরি)

কটি বেড়া ছিল করে, ধড়া কে পরালে তারে;
মাকে ভালবাসি, দিয়ে বাঁশী অসিমুণ্ড কেড়ে নিল॥
(আহা এ কেমন ছেলে মায়ের)

রসন দশন চাপে, সুরাসুর নর কাঁপে,
অধরে ধরে বাঁশী, স্বরে ভুবন-মন মোহিল॥
(ও সে শোণিতরঞ্জিত করা)

ছিল মায়ের রণরঙ্গ, কে সাজাল ত্রিভঙ্গ,
ও কে, রসরঙ্গে, শ্যাম অঙ্গ রাধা সঙ্গে মিশাইল॥
(ও রে কে এমন ভক্ত বল)

শ্যামা আমার শ্যাম আছে,
(কেবল) আকারে অকার কোরেছে,
ও তাই, শ্যামরূপে শ্যামারূপে, এ অপরূপ সাজাইল॥
(আহা কে এমন ভক্ত বল)

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা আছে, প্রকৃতি পুরুষ হোয়েছে;
ওরূপ হৃদয় মাঝে, চিৎ-সরোজে, শ্যামা আমার শ্যাম যে হোল॥
(ও রূপ কাঙ্গাল-ফিকির দে'খে ফকির)

৮। "রণে ভঙ্গ দিও না পাণ্ডব-সেনাগণ।
করবে স্মরণ, ক্ষত্রিয় সন্তান পণ,
দেহে থাকিতে জীবন, প্রতিজ্ঞা না করিব পলায়ন॥
ওরে কুরু সেনাপতি দ্রোণ, সমরে আসিছে যেন সাক্ষাৎ শমন;
ব্যাকুল হ'ও না কেহ, সাবধানে নিজ ব্যূহ কর রক্ষণ,
করেতে করি ধারণ শরাসন॥
কি ভয় আছে মরণে, মারিব মরিব রণে এই ত পণ;
রিপুগণ-করে যদি সম্মুখ-সমরে হয় মরণ,
দিব্য-রথে স্বর্গে করিব গমন॥"

---

৯। "বোল বোল ওহে সূত! আমার জননীর কাছে।
কুরুরাজের অবিচারে, অভিমন্যু প্রাণ ত্যজেছে॥
ধর্ম্মে বোল এই বাণী, অধর্ম্মে পূর্ণ ধরণী,
অভিমন্যু বধে আপনি, দ্রোণগুরু ধনুক ধরেছে॥
পিতা নরনারায়ণ, মাতুল শ্রীমধুসূদন,
জিজ্ঞাসিলে বোল রণে, যে দশা ঘটেছে;
পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখি শরে বিঁধে বধে পাখী,
সেইরূপ আজ সপ্তরথী, (অন্যায়) সমরে আমায় বধেছে॥"

---

কাঙ্গালের হস্তলিপি।

১০। "তোমায় কি বলিব কুরুরাজ হে! বালক কেশরী সমরে।
মৃগকুল তুল্য তোমার সৈন্যকুল সংহারে॥
এড়ে বাণ ছোটে তারা, বহিয়া রুধিরধারা, মরি ভাসিছে ধরা;
ঊর্দ্ধমুখে শিবাগণ নররুধির পান করে॥
তব সেনাপতি পলায়, পশ্চাতে ফিরে নাহি চায়, মদমত্ত করীর প্রায়,
আসি অভিমন্যু সিংহ, রুষিয়া অসি প্রহারে॥"

---

১১। "কর একে ভজনা, ওরে ভব ভাবনা রবে না;
একে আর এক কর্‌লে যোগ, গোলযোগ বৃদ্ধি হবে, পার পাবে না।
একে এক যোগ, দুয়ের কথা, দুই হলে হয় সাধন কোথা,
তবে রে যোগ করে বৃথা, গোলযোগ কর রটনা॥
একের মহিমা অসীমা, করিতে তাহার সীমা,
প্রতি জনে কর্‌লে প্রতিমা রচনা;
অনন্তের না পেয়ে অন্ত, ক্ষান্ত হ'ল যত ভ্রান্ত,
তাই বলি অনন্তের অন্ত, করিতে নারে কল্পনা॥
প্রতিগুণে মূর্ত্তি গড়ে, অনন্ত হইল গড়ে,
আর যদি গড়ে হবে, অনন্ত কল্পনা;
ভেবে একবার দেখ সবাই, অনন্ত এক অন্ত নাই,
দীনহীনের নিবেদন তাই, ছাড় ছাড়রে কল্পনা॥"

---

১২। "থাকিতে সবল, হইয়ে সরল, মম মানস

হরি হরি বলরে, বল।

মন রে হরিনাম কেবল ভবের সম্বল।

ফুরালে অজপা, হবি রে অজপা,

জপা তপা তোর কোথায় রবে বল।

হরি বল্‌লে প্রেমভরে, পাপতাপ হরে,

ত্রিতাপিত হৃদয় করে রে শীতল;

হরিনাম শ্রবণ করে, কত তাপী গেল তরে,

এমন নামে অলস নিজ দোষে কেবল।"

---

১৩। "মরি এই কি সেই বৃন্দাবন!

ঐ যে শ্রী মাধব বিনে, সকলই শ্রীহীনে,

তরুলতা শুষ্ক বন উপবন,

তৃণ নাহি খায়, ক্ষুধায় মৃত প্রায়, ধরায় পড়ে গাভীগণে।

আনন্দ হারায়ে গোপগোপীগণে

নিরানন্দে প'ড়ে আছে ধরাসনে,

উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলে ক্ষণে ক্ষণে, দেখা দেরে কৃষ্ণধন।"

---

১৪। "তুই কি ব্রজে এলি রে ব্রজবাসীর জীবন !
আমরা অনেক দিন দেখি নাই, ওরে প্রাণের ভাই,
কানাই রে তোমার ও চন্দ্রবদন।
সবাই সকাতরে ডাকে সখা তোরে,
নিকটে আয় রূপ দেখি প্রাণভরে ;
একবার বাজাও কানু, ভুবনমোহন স্বরে,
বনে চরুক ধেনু বেনু ক'রে শ্রবণ।
না শুনে তোর বেনু ধেনু না যায় বনে,
অনশনে পড়ে আছে ধরাসনে,
তারা, তৃণ নাহি খায়, ধারা দুনয়নে,
মথুরার পথ পানে চাহে সর্ব্বক্ষণ॥"

---

১৫ "চল্ গো কুলে যাই গোকুলে।
কুলনাশার কথায় কেন, আন্লি আমার প্রভাসকুলে।
ডুবে শ্যামসাগরের জলে, যে কলঙ্ক হল কুলে,
সে কলঙ্ক যাবে না সখী, ধুলে প্রভাসতীর্থজলে !
শ্রীহরিকে ব্রহ্ম জানি, হয়েছি আমরা ব্রহ্মজ্ঞানী,
কর্ম্মফল নাহি জানি, কি কাজ বল তীর্থফলে।
সর্ব্বতীর্থ জানি যারে, কুলশীল দিয়েছি করে,
তীর্থে যদি পেতাম তারে, জীবন দিতাম চরণতলে !"

---

১৬। "রাজ্য পেয়ে প্রাণকানাই, গেলি কি সব ভুলে।
খেতে খেতে মিঠে পেলে, এঠোঁ দিতাম মুখে তুলে।
ব্রজপুরে ছিল বনে, যেতাম সব রাখালগণে,
চলিতে নারিলে তুমি, আমরা নিতাম কাঁধে তুলে।
মায়ের কোলে আমরা সবাই, ঘুমায়ে থাকিতাম কানাই,
স্বপনে দেখিয়ে তোরে, ডাকিতাম ভাই কানাই বলে।"

---

১৭। "ডাক্‌রে মা বলে, আয়রে বাছা কোলে,
জীবন শীতল করি জীবন-কানাই।
গোপাল রে, আমি অনেক দিন মা-বোল শুনি নাই।
কেঁদে সর্ব্বক্ষণে, গেছে রে নয়ন, দেখবে বলে কেবল জীবন যায় নাই।
আমি, যতন কোরে একবার নৃত্য ক'রে, খাওরে বাছা মাখন, এনেছি
নীলরতন, হেথা কি তোর মা আছে, কে ননী খেতে দিয়েছে ;
সত্য বল রে, তাই আমার কাছে, শুনে জীবন জুড়াই।"

---

১৮। তোরা যেতে বল সখী, হেথা যেন না আসে সে বঙ্কিমআঁখি।
শঠশিরোমণি বাঁকা, দ্বারকায় রুক্মিণী সখা,
তিনি এসে করবেন দেখা, প্রয়োজন কি ?
দ্বারকায় কৃষ্ণপ্রেয়সী, শত শত সুরূপসী,
ষোড়শী মহিষী তারা শশীমুখী ;
চাঁদ কি ছাড়ে চকোর পাখী, মাধুর্য্য গেছেন ভুলি ঐ স্বর্গসুখে সুখী।"

---

১৯। "কোথা গেলি ওরে পৃথ্বী পৃথিবীর চূড়ামণি ;
দুরদৃষ্ট ভারতের, অবশিষ্ট দিনমণি ॥
হারায়ে পাণ্ডবকুরু, ভারত হ'ল মহারণ্য,
ওরে পৃথু তোর জন্য পৃথিবীতে ছিল মান্য ;
যবন দলে তোমা ভিন্ন, ইন্দ্রপ্রস্থ রাজধানী ॥
ওরে, সমরসিংহ তুই রে ধন্য, রাখিলি ভারত মান্য,
সমরে করি বিচ্ছিন্ন যবনবাহিনী ;
তোরা যত সহোদরে, সম্মুখ-সংগ্রাম ক'রে,
সবে গেলি রে স্বর্গপুরে, ভারতেরে ডেকে নেরে,
নতুবা ডুবায়ে দে রে, সাগরে এখনি ॥"

---

২০। "জগৎমান্যমান, ওরে আর্য্যসন্তান,
তোরা সবে একবার দেখ্ রে চেয়ে।
আর্য্যরাজলক্ষ্মী-বদন, দেখ্ রে অকলঙ্ক যেমন,
মেলে না এমন জগৎ খুঁজিয়ে ॥
( আহা )
থাকিতে তোদের দেহেতে জীবন, ভারত ছেড়ে এখন,
এমন আর্য্য-রাজলক্ষ্মী যায় চলিয়ে ;
তোরা কেমনি দেখিবি, ( বল্ রে ) কি সুখে রহিবি,
সুখময়ী লক্ষ্মী হারা হয়ে ॥ ( হায় রে )

যে আর্য্যগণ আদরে, সাজাল লক্ষ্মীরে,
সিন্ধু মথি, গিরি উলটিয়ে ;
তোরা সে বংশে জন্মিয়ে, কাপুরুষ হ'য়ে,
গৌরব হারালি প্রাণভয়ে, (ভীরু দেখ্ রে দেখ )
এখন ( হায় রে ) অতি যত্নের ধন,
রাজলক্ষ্মী পালায় যবন-ভয়ে ॥"

---

২১। "হিমালয় যাও হে চলে, হিমাচলে কাজ কি গোলে।
আমাদের মহামায়া মা কিরে তোর কথায় ভোলে ॥
দক্ষালয় গেল সতী জানে সকলে,
আর না ফিরে এলো, ঘটবে কি তাই কপালে ॥
তোদের রাজরাজার জ্ঞান থাকে না রাগ উদয় হ'লে ;
এবারে মা প্রাণ ত্যজিলে, মা পাবো না মা হারালে ॥"

---

২২। "কোন্ দুর্গা আমার নন্দিনী।
আমি যে দিকেতে চাই, দুর্গা দেখ্তে পাই,
দুর্গা বই আর অন্য নাই ;
ঐ যে ত্রিজগতের লোকে, দুর্গা বলে ডাকে,
করে জয় দুর্গাধ্বনি ॥

ঘরে ঘরে দুর্গা পূজা করে ঘটে,
আবার আমার দুর্গা দেখি চিত্তপটে ;
এ সব দুর্গা কি আমারি মেয়ে বটে,
সত্য বল তাই শুনি ॥
আমার উমাধন দ্বিভুজধারিণী,
এযে—দশভুজা সিংহবাহিনী,
ছলনা করিয়া ভুলাতে রমণী,
আন্‌লে কার রমণী ॥"

---

২৩। প্রজার প্রাণ যায় প্রজানাথ ত্যজ আলস্য।
এ দুর্ভিক্ষে, দিয়া ভিক্ষে, কর রক্ষে হে শ্রীবৎস ॥
অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, নাশে সৃষ্টি, ক্ষেতে নাই শস্য ;
পয়োধরে জননী মরে, শিশু কাঁদে তার বক্ষ পরে,
কেবা তারে জিজ্ঞাসা করে, ব্যাকুল সব মনুষ্য ;
ভীষণ কাণ্ড, উল্কাপিণ্ড নাশে ধ্বজ, গজ, অশ্ব ;
শব আহারে, দ্বন্দ্ব করে শিবা শকুন বিকটাস্য ॥"

---

## "বাউল-সঙ্গীত"

এই প্রথম খণ্ডের উপসংহারকালে আমরা আর কয়েকটী বাউল-সঙ্গীত দিতেছি। কাঙ্গালের অসংখ্য সঙ্গীত চারিদিকে নানা ভাবে এমন বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে যে, তাহা সংগ্রহ করা এখনই অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে; কিছুদিন পরে এই সকল সঙ্গীতের অনেকগুলির অস্তিত্ব লুপ্ত হইবে। আমরা দীন হীন কাঙ্গালের দীন হীন শিষ্য, আমরা কি করিতে পারি ?—

১। "ডাকে করুণস্বরে, পাখীর হ'ল কি ?
একে, ঘোর রাতি, মাঝে নদী, দু'পারে দু'পাখী॥ (আছে)
একটী পাখী ডেকে বলে, ভেসে যায় সে নয়নজলে; (হায় রে)
আমি তোমা বিনে এ ঘোর রাতে, কেমনে প্রাণ রাখি। (বল)
আর এক পাখী বলে তারে, বিনাইয়ে উচ্চৈঃস্বরে; (হায় রে)
এখনও যে নিশি আছে, চেয়ে দেখ প্রাণসখি!
তুমি যদি উড় এখন, আমায় পাবে না, আর যাবে জীবন; (হায় রে)
তাই বলি নিশি পোহাইলে, দুয়ে হবে দেখাদেখি॥
কাঙ্গাল কেঁদে বলে আবার, কবে নিশি প্রভাত হবে আমার; (হায় রে)
গিয়ে নদীর পারে মিল্‌বে তবে, আত্মা-চকাচকী॥ (আমার)

---

২। "ওরে মন! মনেরি মন. বোঝে না মন,
এমনি রে তার বুদ্ধি কাঁচা।
মন আমার ভবের মুটে মরে খেটে,
নাহি জোটে পানি-গামছা;
মন আমরা শাল রুমালের চিন্তা ক'রে
মরছে ঘুরে, হ'চ্ছে রাজা॥

কাপড় যে হাতে খাট, বহর আঁট,
মন দিতে চায় লম্বা কোঁচা ;
ময়ূরের নৃত্য দেখে, মনের সুখে,
প্যাকম্ ধর্‌তে চায় রে পেঁচা।
মন আমার অহঙ্কারে, মর্‌ছে ঘুরে,
মাথায় ক'রে জ্ঞানের বোঝা ;

ওরে, এই আকাশ যাঁরে, ধরতে নারে,
তাঁর আকাশে দিচ্ছে খোঁচা।
কাঙ্গাল কয়, যে জন যত বোঝে তত
ব'য়ে মরে ভূতের বোঝা ;
অত বোঝাপড়ায় কায নাই রে মন !
বোঝ সোজা চল সোজা ॥

---

৩। মনের কি বিষম আশা, কি তামাসা,
ভাব্‌তে গেলে মগজ নড়ে।
মন আমার আকাশ পাতাল, ধায় রসাতল,
তবু রে পিপাসা বাড়ে ;
সে যে নির্জ্জনে বসে, মনের খোষে,
মনে মনোরাজ্য গড়ে।

যদি রে মন-হাতীরে, জোরে ধরে,
জ্ঞানের অঙ্কুশ মারি ঘাড়ে ;
সে যে রে মাত্‌লা হাতীর মত, নত—
হয় না আবার কাদায় পড়ে।
যে জন এই মন-হাতীরে, যতন কোরে,
রেখেছেন এই দেহের গড়ে ;
যদি রে তাঁরে ডাক্‌ব, মনে করি,
মন-করী শুয়ে পড়ে।
কাঙ্গাল কয় দিলে প্রবোধ, মন যে অবোধ,
ছল করিয়ে সুপথ ছাড়ে ;
ওরে সে গুপ্তিপাড়ার, মাটীর মত,
শিব গড়াতে' বানর গড়ে।"

---

৩। "মানুষ বড় কিসে, ভাবি তিন বেলা।
সে ত বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান পেয়ে, না বোঝে পরের জ্বালা॥
গাছেতে ফল ধরে যত, নত হয়ে বিলায় সে ত খায় না ;
মানুষ ধন জ্ঞান বিদ্যা পেলে, লাগায় তালার উপর তালা।
গাছের তলে বস্‌লে এসে, সেত ছায়া দেয়রে, ভালবেসে
দেখ না ;
কাট্‌তে গেলেও ছায়া দান করে সে, গাছ না হয় রে উতলা।

ঝড় বৃষ্টি শিলা সয়ে, আছে স্থির ভাবেতে দাঁড়াইয়ে, দেখ না ;
যাচ্ছে এক উদ্দেশে উর্দ্ধদেশে, তার শক্তি কি অচলা !
কাঙ্গাল বলে বড় যে জন, সে ত ফকীর হয় রে পরের কারণ,
দেখ্‌না ;
ঘর ছেড়ে তাই যোগী ঋষি, সার করে গাছের তলা।"

---

৪। "ভবে আসা যাওয়া আজব কারখানা।
তুমি, পড়ে শুনে, চোকে দেখে, তবু হয়ে র'লে কাণা ॥
গ্রহ তিথি মাস যত, ঘোরে ফেরে অবিরত দেখ্‌না ;
আবার বছর গেলে, বছর আসে, কেবল দিন গেলে ক্ষণ হয় না ॥
যেমন আবর্জ্জনা স্রোতে ভেসে, গিয়ে দোয়ানীতে ফিরে আসে
দেখ্‌না ;
তেমন চন্দ্র সূর্য্য ঘুর্‌ছে ফির্‌ছে, কিন্তু ছাড়ছে না তার ঠিক্‌না।
গাছেতে ফল, ফলেতে গাছ, কেবল পৃথক্ মাত্র দুদিন
আগ্‌ পাছ্‌ দেখ্‌না ;
আজ, ফিকিরচাঁদ প্রকৃতি-পাগল, দেখে ছিন্নমস্তার নাচ্‌না ॥
ফিকিরচাঁদ কয় দীনদরদি, ঘুরে সংসার-ঘানে নিরবধি সয় না ;
এবার, এই দয়া করিবে মোরে, যেন আবার ঘুরতে হয় না ॥"

---

৫। "মরি কার, এ বালিকা ধূলাখেলা খেলিতেছে।
এই যে অসীম জগতের মাঝে একাকিনী বসে আছে॥

( অভয়া হয়ে )

আহা! গড়ছে কত ধূলার ঘর, দেখিতে সুন্দর!
ঘর আপনি গ'ড়ে আপনি রসে হাসিতেছে;
ঘর আপ্‌নি গ'ড়ে,আপনি ধ'রে ভেঙ্গে চুরে ফেলিতেছে॥ (গড়া ঘর)

আপ্‌নি পুরুষ আপ্‌নি মেয়ে, আপ্‌নি দেয় আপনার বিয়ে,
আপনার মত পুরুষ মেয়ে প্রসব করিছে;
ঐ যে প্রসব ক'রে, বুকে ধ'রে, দুধ দিয়ে প্রাণ বধিতেছে।

( মা হ'য়ে মা )

খেলার ঘর নারী নরে, চারিদিকে আছে ঘিরে,
কুমারের চাকের মত ঘুরিতেছে;
কে বল্‌তে পারে, অবিরত কত হয়, কত যেতেছে॥

( খেলার ঘরে )

এক মায়ের কোলে সবাই আছে, পৃথক্ পৃথক্ ভাবিতেছে,
যে যেমন ভাবে, সে তেমন দেখিতেছে;
ঐ যে, ভয়াভয়া জয়াজয়া মায়াকায়া দেখিতেছে। ( সকলে )

খেলাচুরো ভাঙ্গলাম ব'লে, মেয়ে যখন যাচ্ছে চলে,
ঘর নর মিশে তখন এক হতেছে;
এ দীন কাঙ্গাল বলে, জলবিম্ব জল হয়ে জলে মিশিতেছে॥

( স্থলে জলে )

---

৬। "দেশটা মাতালে রে দুই মাতালে ?
মদের ঢালাঢালি, ঢলাঢলি ডুবিয়ে সকল ডুবালে॥ ( মদে )
এক মাতাল দেখ হায়, কেবল শুঁড়ির সেবায়,
তালুক মুলুক টাকা কড়ি সকলি খোয়ায় ;
আবার চেয়ে দেখ, মাতাল এক, জমিদারী যায় ফেলে ॥ ( মদে )
এক মাতালে মদ খায়, ও সে ভূমেতে গড়ায়,
মরার মত পড়ে থাকে আবার উঠে খায় ;
ও তার মুখে গন্ধ, ক্ষুধা মন্দ, চোখের তারা কপালে। ( ওঠে )
আর এক মাতাল দেখ হায় ! দশা তুল্য তুলনায়,
পৃথক কেবল নিজের ভাঁটি, খাঁটি মাল জন্মায় ;
খেজুর রসের মত, অবিরত, চুয়ায়ে পড়ে গালে। ( সে মদ )
দেখ এই দুই মাতালে, পৃথক মরণকালে,
শুঁড়ির মাতাল মরে যকৃৎ পীলায় ঘা হ'লে ;
মরে আর এক মাতাল, বলে কাঙ্গাল, ব্রহ্মরন্ধ্র ফাটিলে ॥ (মদে)
ডেকে বলিছে কাঙ্গাল, দেখ আর দুটি মাতাল,
নিতাই গৌর গুণের ঠাকুর, পরমদয়াল ;
প্রেমে মাতোয়ারা, জ্ঞানহারা, নাচে আর হরি বলে ॥ (প্রেমে)

---

৭। "ব'সে চাতক পাখী ডাকে রে ডালে !
মেঘের জল বিনে পিপাসা যায় না, তাই ফটীক জল দে বলে।
ভাগ্যফলেতে আকাশে, যদি মেঘে বারি বর্ষে, হায় রে !
তবে ত তার পিপাসা যায়, তুষ্ট না হয় অন্য জলে।

না হইলে মেঘের প্রকাশ,

দেখ, চাতক ত আর ছাড়ে না তার আশ, হায়রে ;

মেঘ এসে জল দেয় তারে, দেখ যথাসময়কালে।

চাতক পাখীর ভাবটি দেখে, কাঙ্গাল নীরব হয় না, তাঁরে ডাকে, হায়রে !

কাঙ্গাল জল পাবে ভরসা আছে, দয়াময়ের দয়া হলে ॥”

---

৮। "আয়রে ! আয়, কে দেখিবি সাধকের সংসার আনন্দময়।

সংসারের জ্বালা যাবে, শীতল হবে, তাপিত হৃদয় ( সংসার পোড়া )

মায়ের কোলে ছেলে হাসে, স্তন্য-পানে সুখে ভাসে,

আবার স্নেহাভাবে মায়ের মুখ কি শোভা পায় ;

সাধক স্ত্রীর কোলে দে'খে ছেলে, ভেসে যায় রে চোখের ধারায় ॥

( গণেশজননী বলে )

ছেলে কোলে লয়ে আবার, মুখে তুলে দিচ্ছে আহার,

যখন হাত পেতে "দে দে' বল্‌ছে ছেলে যে তাঁর ;

সাধক আর কি রে রয়, নাচিয়ে কয়,

খাওরে আমার আনন্দলাল। ( প্রাণের গোপাল )

মেয়েটিকে বুকে লয়ে, সাজায়ে অলঙ্কার দিয়ে,

মেয়ে, হেসে হেসে স্নেহরসে ভেসে বেড়ায় ;

সাধক হৃদয় পরে, মেয়ের ধরে, চক্ষু মুদে অজ্ঞান হয়। ( এই আমার উমা বলে )

ধড়াচুড়া বেঁধে দিয়ে, ছেলেরে কৃষ্ণ সাজায়ে, মেয়েটিকে দাঁড় করে তাহার বাঁয় ;

কভু শিব-গৌরী সাজাইয়ে, যুগলরূপে পাগল হয় ॥ ( ভক্ত সাধক )

---

৯। “আবার কিরূপ দেখি, স্বরূপমাখা অরূপীর গায়।
ও রূপ ধরে না ব্রহ্মাণ্ডমাঝে,উথলিয়ে ভাসিয়ে যায়। (অরূপীর রূপ)
রূপটি ঠিক মদনমোহন, শ্যামা বলে ভুলও যে হয় ;
সকল অঙ্গে তারার অলঙ্কার শোভা পায় ;
আবার পিছনে ঠিক নবভানুছটা আনি কে দিল হায়॥ (শ্যামের মাথে)
কি চঞ্চলরূপখানি মার, থর থর কাঁপিছে হায় ;
ধরি ধরি মনে করি, ধরা না যায় ;
আবার রক্তমাখা নূপুর পায়, রুণু রুণু নেচে বেড়ায়।
( শ্যাম শ্যামা )

সম্বর ও রূপ মা, ক্ষুদ্র হৃদে আর ধরে না,
রূপে যে বিশ্ব অম্বর ভাসিয়ে যায় ;
বুঝলাম এই জন্য আনন্দময়ী দিগম্বরী সাধকে কয়।
রূপে বিশ্ব ডুবে গেল, বল্ দেখি মা থাকব কোথায় ;
রূপসাগরে ডুবে থাকা ভাল ত নয় ;
ফিকির এই সার প্রার্থনা মাগো, মাঝে মাঝে দেখাবি পায়॥
( হৃদ-মন্দিরে )”

---

## শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের

অন্যান্য পুস্তক।

# হিমালয়

( চতুর্থ সংস্করণ )

শ্রীযুক্ত জলধর বাবুর পুস্তকের নাম করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে 'হিমালয়ের' কথা বলিতে হয়। এই পুস্তকখানি লিখিয়া জলধর বাবু যদি তাঁহার লেখনীকে একেবারে বিশ্রাম দিতেন, তাহা হইলেও তাঁহাকে সর্ব্বপ্রধান ভ্রমণ-বৃত্তান্ত-লেখক বলিয়া সাহিত্য-জগৎ অভ্যর্থনা করিত। হিমালয়ের চতুর্থ সংস্করণ হইয়াছে, হিমালয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য-পরীক্ষার পাঠ্য হইয়াছে, হিমালয় লিখিয়া জলধরবাবু ধন্য হইয়াছেন, বাঙ্গলা-সাহিত্য লাভবান্ হইয়াছে। এমন সুন্দর পুস্তক ঘরে ঘরে থাকা কর্ত্তব্য। সুন্দর ছাপা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই, মূল্য পাঁচ সিকা ( ১৷০ ) মাত্র।

---

# প্রবাস-চিত্র

( দ্বিতীয় সংস্করণ )

এমন সুন্দর, এমন প্রাণস্পর্শী ভাষায় প্রবাসের কথা জলধর বাবু ব্যতীত আর কেহ বলিতে পারেন কি না সন্দেহ। প্রবাস-চিত্র বাঙ্গলা-সাহিত্যের একখানি অমূল্য রত্ন। যেমন বর্ণনা-কৌশল, তেমনই ভাবের প্রবাহ, তেমনই ভাষার মাধুর্য্য; পড়িতে পড়িতে আত্মহারা হইতে হয়। মূল্য এক টাকা মাত্র।

# পথিক

## ( দ্বিতীয় সংস্করণ )

পথিকে জলধর বাবু অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। তাঁহার পথিক পড়িলে সত্য সত্যই মনে হয়, আমরা সকলেই পথিক—দুইদিন পরে দেশে চলিয়া যাইব। যিনি লোকের হৃদয়ে এমন অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করিয়া দিতে পারেন, তিনি যে একজন উচ্চ-শ্রেণীর লেখক তাহা আর বলিতে হইবে না। সুন্দর কাগজে ছাপা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই, মূল্য এক টাকা মাত্র।

---

# হিমাদ্রি

হিমাদ্রি 'হিমালয়েরই' স্কুলপাঠ্য সংস্করণ। হিমালয় চলিত ভাষায় লিখিত, হিমাদ্রি সাধুভাষায় লিখিত ; পড়িতে বসিলে ইহাকে নূতন পুস্তক বলিয়া মনে হয়। হিমালয়ের বর্ণনা এই পুস্তকে অতি সুন্দরভাবে ও ওজস্বিনী ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে। ছাত্রগণের পাঠ্য বলিয়া ইহার মূল্য যথাসম্ভব সুলভ করা হইয়াছে। মূল্য মাত্র বার আনা।

---

# পুরাতন পঞ্জিকা

পঞ্জিকা কখনও পুরাতন হয় না; কিন্তু জলধরবাবু অনেকদিন পরে, হিমালয়ের কথা এই পুস্তকে বলিয়াছেন বলিয়া ইহার নাম 'পুরাতন-পঞ্জিকা' রাখিয়াছেন। এখানি তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তের পরিশিষ্ট বলিলেই হয়। হিমালয়, প্রবাস-চিত্র, পথিক, হিমাদ্রি এবং এই পুরাতন পঞ্জিকা—এই পাঁচখানি পুস্তক একসঙ্গে পড়িলে হিমালয়ের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারা যায়, জলধর বাবু যে সত্য সত্যই বাঙ্গলা সাহিত্যে অদ্বিতীয় ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লেখক তাহা বুঝিতে পারা যায়। সুন্দর বাঁধাই, পুরাতন পঞ্জিকার মূল্য অতি সুলভ, বার আনা মাত্র।

---

# নৈবেদ্য

এখানি কয়েকটি ছোট গল্পের সমষ্টি। নৈবেদ্য প্রকৃতই নৈবেদ্য; ইহা দেবভোগ্যই বটে। যিনি জলধর বাবুর নৈবেদ্য পড়িবেন, যিনি তাঁহার অন্ধের কাহিনী, প্রতীক্ষা প্রভৃতি গল্প পড়িবেন, তিনিই একবাক্যে বলিবেন জলধর বাবু ছোট গল্প লিখিতে কেমন সিদ্ধহস্ত, তিনি পাঠকের হৃদয়ে কি অপূর্ব্ব ভাব জাগাইয়া তুলিতে পারেন। মূল্য আট আনা মাত্র।

---

# ছোটকাকী

জলধর বাবুর ছোটকাকী কয়েকটী গল্পের সমষ্টি। ছোটকাকী তাহার প্রথম গল্প। এক ছোটকাকী গল্পটী পড়িলেই পুস্তক-ক্রয় সার্থক বলিয়া মনে হইবে। এই সংগ্রহের গল্পগুলি পড়িলে চক্ষু ফাটিয়া জল আসে, হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়ে, আর গ্রন্থকারকে সহস্রমুখে প্রশংসা করিতে হয়। সুন্দর বাঁধাই পুস্তকের মূল্য বার আনা মাত্র।

---

# নূতন গিন্নী

বহু পুরাতন হইলেও গিন্নী চিরদিনই নূতন। কিন্তু তাহা ভাবিয়া এ পুস্তকের নামকরণ হয় নাই। নূতন গিন্নীর ইতিহাস সকলেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য। আজকাল দেশের যে অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে এই পুস্তকখানি কর্ত্তা, গিন্নী, বৌ এমন কি সকলেরই পড়া কর্ত্তব্য। মূল্য দশ আনা মাত্র।

---

# দুঃখিনী

একটী বালবিধবার সুন্দর চিত্র। এই পুস্তকখানি জলধর বাবু ১৫ বৎসর বয়সের সময় লিখিয়াছিলেন; এখন পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে তিনি বলেন, তাঁহার হাত দিয়া বালবিধবার এমন সুন্দর কাহিনী আর বাহির হইতে পারে না। ঘরে ঘরে দিন-পঞ্জিকার মত এই পুস্তকখানি পঠিত হওয়া কর্ত্তব্য। মূল্য বার আনা মাত্র।

# আমার বর

## অলৌকিক—কিন্তু অস্বাভাবিক নহে।

বাঙ্গলা সাহিত্যে শ্রীযুক্ত জলধর সেনের পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। তিনি আপনার শক্তি ও সামর্থ্য লইয়া বাঙ্গলা-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। তিনি বহু গল্পপুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন এবং সুধী-সমাজে তাহা সমাদৃত হইয়াছে। তাঁহার এই নূতন গল্পপুস্তক "আমার বর" ভাষার ললিত-বিন্যাসে, বর্ণনার চারুচিত্রে, গল্প বলিবার মোহিনী ভঙ্গীতে এই শ্রেণীর অপর গ্রন্থসমূহ অতিক্রম করিয়াছে, ইহা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি। জলধরবাবুর গ্রন্থে উচ্ছৃঙ্খলতা নাই, কপটতা নাই, রসবিকার নাই। এই পুস্তক কেন, জলধর বাবুর যে কোন পুস্তক নিঃসঙ্কোচে মা, স্ত্রী, ভগিনী ও কন্যার হস্তে দেওয়া যাইতে পারে; বাঙ্গলা-সাহিত্যে—এই উচ্ছৃঙ্খলতার দিনে—ইহা বড় কম প্রশংসার কথা নহে। জলধরবাবুর গ্রন্থের ন্যায় সুরুচি-সম্পন্ন, সারবান্ ও স্বাস্থ্যবান্ গ্রন্থ বাঙ্গলা-সাহিত্যে বিরল, ইহা অবিসংবাদিত সত্য। এই "আমার বর" পুস্তকখানি সংবাদ-পত্রে ও সুধী-পাঠকগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে প্রশংসিত। বইখানি প্যারাগন প্রেসে মুদ্রিত, সুতরাং ছাপা সুন্দর। যেমন উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ছাপা, তেমনই বহুমূল্য রেশমী কাপড়ে বাঁধাই; তাহার পর আবার ছয়খানি উৎকৃষ্ট চিত্রে এই পুস্তক সুশোভিত; অথচ ইহার মূল্য এই সকলের তুলনায় অতি সামান্য—পাঁচ সিকা মাত্র; ডাকমাশুল তিন আনা।

---

# সীতাদেবী

জনমদুঃখিনী সীতার পবিত্র জীবন-কাহিনী অতি সরল, সুন্দর, অনেক প্রাণস্পর্শী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া জলধর বাবু তাঁহার অপূর্ব্ব রচনা-শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। পুস্তকখানি পড়িতে পড়িতে অনেক স্থানে অশ্রু সংবরণ করা যায় না। বহু সুরঞ্জিত চিত্র-শোভিত, অতি উৎকৃষ্ট বাঁধাই। পুস্তকের তুলনায় মূল্য অতি সুলভ, এক টাকা মাত্র।

---

# বিশুদাদা

( সুবৃহৎ উপন্যাস )

পনর বৎসর বয়সের সময় জলধরবাবু 'দুঃখিনী' উপন্যাস লিখিয়াছেন, আর ৫২ বৎসর বয়সে 'বিশুদাদা' লিখিয়াছেন। এই উৎকৃষ্ট উপন্যাস যখন ধারাবাহিকরূপে 'মানসী' পত্রে প্রকাশিত হইতেছিল, তখন উক্ত পত্রের গ্রাহক ও পাঠকগণ বিশুদাদার পরবর্ত্তী ঘটনা জানিবার জন্য যে প্রকার ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেন, তাহা হইতেই এই পুস্তকের আদরের কথা বুঝিতে পারা যায়। বিশুদাদা যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা একবাক্যে প্রশংসা করিয়াছেন। এমন সুন্দর, এমন প্রাণস্পর্শী কাহিনী পড়িলে শুধু যে আনন্দ লাভ হয় তাহা নহে, ইহা পাঠের সময় সত্য সত্যই হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় পবিত্র ভাবের সঞ্চার হয়; আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, কি পাপে আমরা এখন বিশুদাদার মত প্রভুপরায়ণ, মহানুভব, দেবহৃদয় ভৃত্য, বন্ধু, অভিভাবক পান নাই। এই পুস্তকে যে কয়েকটী গান আছে, তাহা অতুল্য, অমূল্য। এই পুস্তক লিখিয়া জলধরবাবু ধন্য হইয়াছেন। "বিশুদাদার" দুইখানি আলোক-চিত্র আছে। উৎকৃষ্ট কাগজে, সুন্দর ছাপা, মনোহর বাঁধাই, মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র।